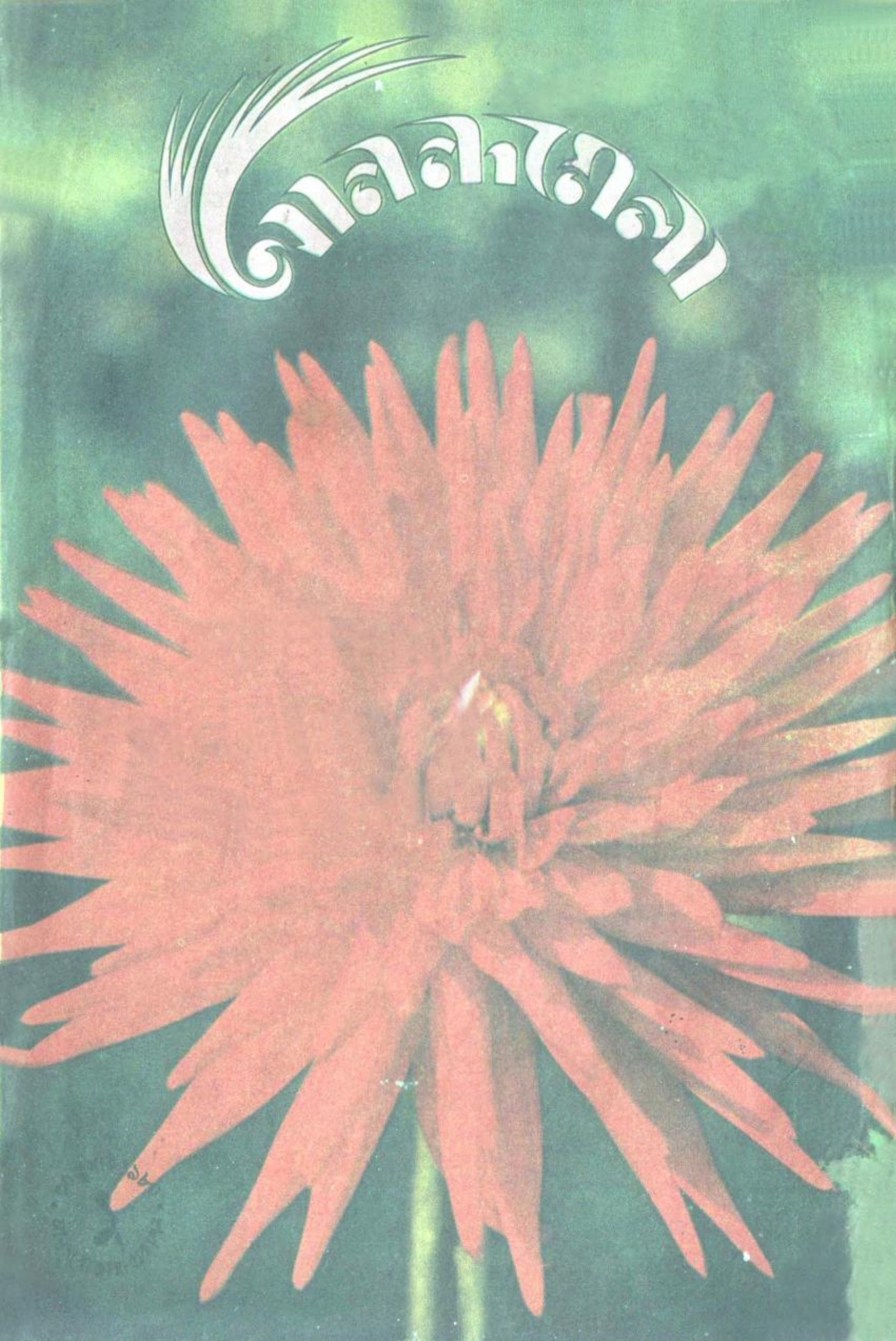
অলকানন্দা

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

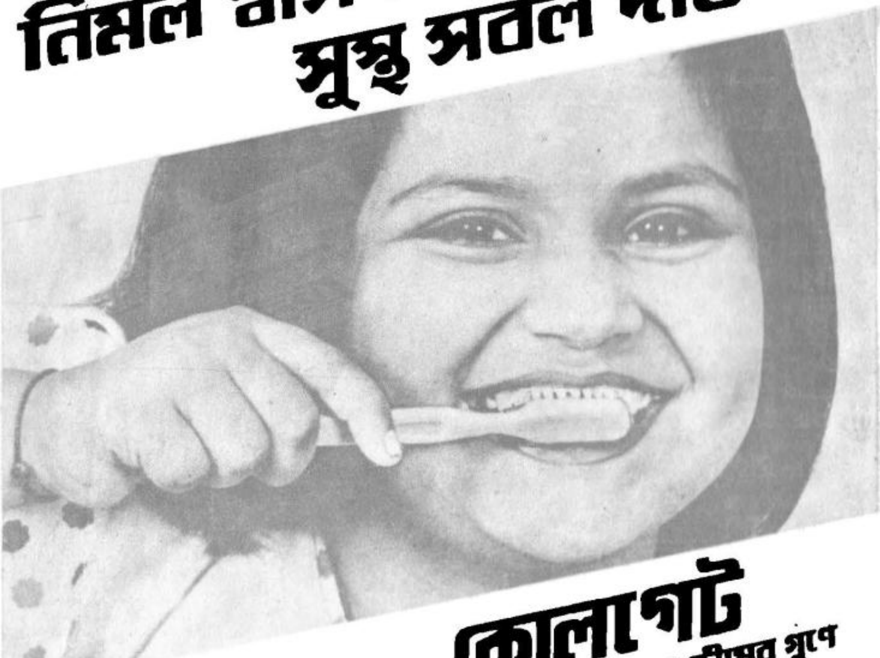

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

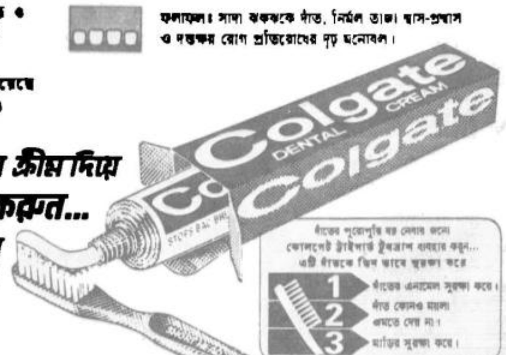

DC.G.74 BN

আনন্দমেলা

১৪ শ্রাবণ ১৩৮৭ • ৩০ জুলাই ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ৮ সংখ্যা

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১০

গল্প
আস্তে আস্তে । হিমানীশ গোস্বামী ১৪
মোরগ-লড়াই । মানসী দাশগুপ্ত ১৯
গুংগা । অগ্নীশ বর্ধন ৩০
ডাফরিন ও সেই লোকটি । সুবোধ মজুমদার ৫৮

উপন্যাস
রুকু-সুকু । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৬
কে । বিমল মিত্র ৩৭

ভ্রমণ-কাহিনী
বুদাপেস্তে তিন দিন । পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় ৪

ছড়া
গিরিধারীর বায়না । চিত্তরঞ্জন দেব ২৯
ট্যাকসো । রঞ্জন ভাদুড়ী ৪৩
টুটুলের জিজ্ঞাসা । দেবাশিস বসু ৪৩

বিশ্ববিচিত্রা
গোলাপি ব্যালেরিনা । দিদিমণি ৪৪

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

খেলাধুলো
বিরাশির প্রস্তুতি কোথায় ।
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি.কে.) ৫০
বর্গ এখনই কিংবদন্তী । অরিজিৎ সেন ৫৪
ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক । মণীশ মৌলিক ৫৬

লেখাপড়া
ভাষার খেলা । কুন্তক ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ১৩, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৪৭, আঁকো-শেখো ৬৬
পি. কে. ব্যানার্জির পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদল বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
দুনিয়ার ঘনাদা ৬৲
শংকর
এক ব্যাগ শংকর ৭৲
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
অবিশ্বাস্য ৬৲
শীর্ষেন্দু পত্রী
হাসতে হাসতে খুন ৬৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সিকেপিকেটিকে ৫৲
কয়সলা ৭৲
পিনডিদার গপ্পো ৬৲
প্রফুল্ল রায়
সেনাপতি নিরুদ্দেশ ৫৲
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে ৫৲
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যে মা ৪৲
গিরিধারী কুণ্ডু
দুষ্টু টুসটুসি ৫৲
বুলাই ৫৲
ফণিভূষণ আচার্য
সোনার সুটকেস ৬৲
অরুণরতন ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানীর দপ্তর ৫৲
পৃথিবীর বাইরে কি
বুদ্ধিমান জীব আছে? ৮৲
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
বনের আসর ৪৲
ভয়-ভূতুড়ে ৫৲
নিঝুম রাতের আতঙ্ক ৬৲
[illegible] ভয়ংকর ৬৲
অমরনাথ রায়
বিশ্বের বিজ্ঞানী ৮৲
সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ ৮৲
ভূপেন ভট্টাচার্য
বিচিত্র রূপকথা ৫৲
সুধীর রায়চৌধুরী
মেলা থেকে ঝামেলা ৫৲
সুনীল চৌধুরী
সুন্দর দুর্গমের পথে ৬৲
পরিচয় গুপ্ত
ভৌতিক শিকার
কাহিনী ৪৲
ভূত যখন পুত ৪৲
মানুষ যখন ভয়ংকর ৫৲
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনের আতঙ্ক ৮৲
বাক্সার জঙ্গলে ৭৲
শিকারের বিচিত্র
কাহিনী ১০৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সামন্ত বাড়ি ৬৲
হলুদ আতঙ্ক ৫৲
কার্তিক ঘোষ
পাতার বাঁশি ৫৲

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জুল ভের্নের
যত ঝকি
যত ঝামেলা ১০৲
শ্রেষ্ঠ গল্প ৭৲
ভানিসোয়াভ লেম-এর
পৃথিবী কী করে
বাঁচলো ৬৲
মরডেকাই রিচলার-এর
জেকব টুই টুই আর
ফণাধর দন্তপাটি
মুখোমুখি ৬৲
র‍্যানডল্ফ স্টোর
মিডনাইট ১০৲
শ্রাবন্তী ঘোষ অনূদিত
চিনুয়া আচিবি'র
চিকি আর নদী ৫৲

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩৪-৫০৩৫

বুদাপেস্তে তিন দিন

পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়

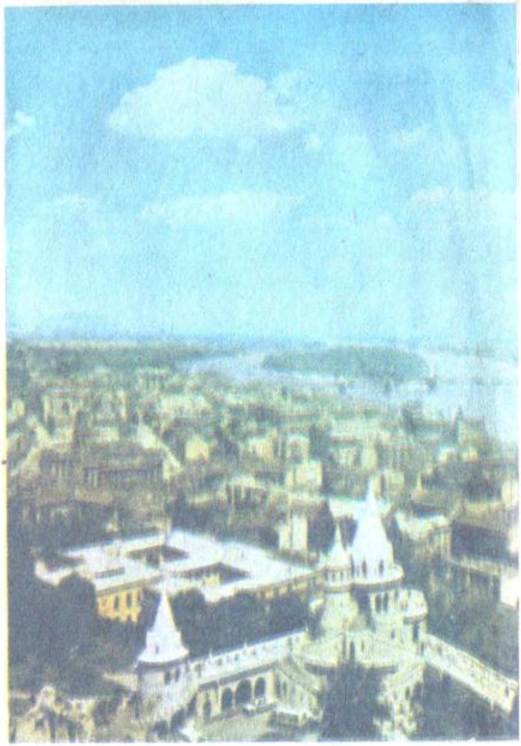

বিদেশ ঘুরে আসা এখন আর কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। অবশ্য এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে যাওয়া এখনও খুব সহজ হয়ে ওঠেনি, সেইরকমই একটি শহর হাঙ্গারির রাজধানী বুদাপেস্ত। সেখানে যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটে গেল। বম্বে থেকে সুইস এয়ারে জুরিক, ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে ২২ এপ্রিল '৮০ স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটেয় বুদাপেস্ত বিমান-বন্দরে অবতরণ করলাম। বহু বিদেশী এই শহরে ছুটি কাটাতে আসেন।

বিমান-বন্দরটি অন্যান্য ইউরোপীয় বিমান-বন্দরের মতো অত সুন্দর নয়। চেকিং-পর্বে অনেকটা সময় গেল। "ব্যাগেজ্ক্লেম" চত্বরে গিয়ে দেখি শুধু আমারই স্যুটকেসটা কনভেয়ারে ঘুরছে, আর সবাই তাঁদের মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। লটবহর নিয়ে হোটেলে যাবার জন্যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাবার আগে দেখে নিলাম প্ল্যাকার্ড হাতে

বুদা ও পেস্তের মধ্যে যোগরক্ষা করছে যে-সব সেতু, তার একটি—চেন ব্রিজ

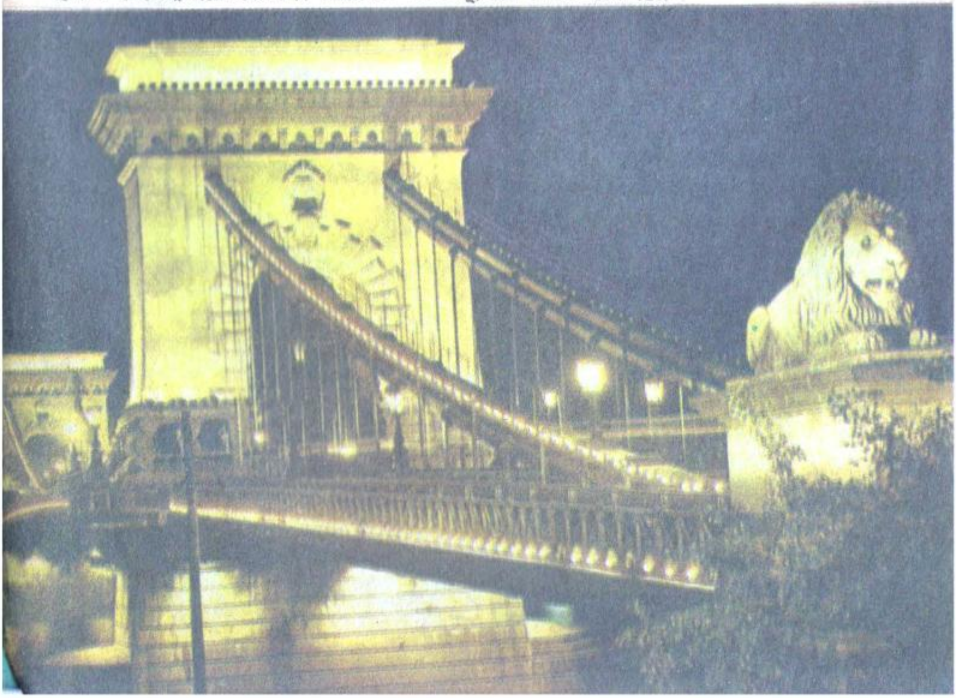

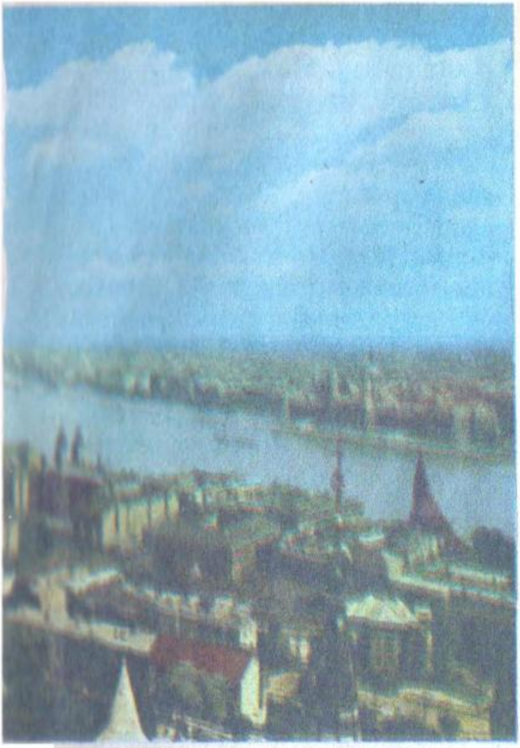

আকাশ থেকে বুদা ও পেস্ত, মধ্যে নদী

আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করছেন কি না। না, কেউ আসেননি। তখন একটি ইনফরমেশন সেন্টারে গেলাম। সেখানে একজন মাত্র মহিলা ইংরেজি বোঝেন। তিনি আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। আমি যে হোটেলে যাব সেখানে যেতে ট্যাক্সি-ভাড়া কত হতে পারে বা ড্রাইভারকে কী বললে বুঝতে পারবে জেনে নিলাম। টাকা এক্সচেঞ্জ করার কাউন্টারের মহিলাটিও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা বললেন। এখানকার টাকাকে ফোরিন্ট বলে। বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় ইনফরমেশন কাউন্টারের সেই মহিলাটি ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বললেন, "আমাকে আপনার ট্যাক্সিতে নিয়ে যাবেন? আমি আপনার হোটেলের দিকেই যাব।" আমি সম্মতি জানালাম। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে দেখলাম আকাশ মেঘলা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে হাওয়া। ভদ্রমহিলা বললেন সেই দিনটি এই ঋতুর সবচেয়ে ঠাণ্ডা দি[illegible] কারণ তার আগের দিন বরফ পড়েছে এপ্রিল মাস মানে বুদাপেস্তে বসন্তকাল, [illegible] সময় এইরকম বরফ পড়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ইণ্ডিয়া একটা বিশাল

মিলেনিয়াম মনুমেন্ট ; সামনে প্রশস্ত চত্বর

দেশ।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "আচ্ছা, ইন্ডিয়াতে এখনও অনেক বাঘ আছে না কমে এসেছে?" আমি বললাম, "ইন্ডিয়া একবার ঘুরে আসুন না।" একটু হতাশার সুরে তিনি বললেন, "ইউরোপের অন্য শহরই দেখা হল না, ইন্ডিয়া তো দূরের কথা।"

হোটেল সাবাচাক-এ এসে ট্যাক্সি থামল। 'সাবাচাক' শব্দের অর্থ জনতার স্বাধীনতা। ভদ্রমহিলা নেমে বিদায় নিলেন। পাঁচতলা হোটেলটা মোটামুটি সুন্দর, শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ঘরের ভেতরের ব্যবস্থা অত্যন্ত সাদামাটা। খাটের ও ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হয় কিছু শিক্ষানবিশদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিজাত হোটেলে যেসব আরামদায়ক ব্যবস্থা থাকে তা প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার পেয়ে গেলাম, তার জন্যে দক্ষিণাও দিতে হল বেশি! তেরাত্তির থাকা ও ব্রেকফাস্টের জন্যে ১৪৪ মার্কিন ডলার। পশ্চিম ইউরোপীয় ব্রেকফাস্টের মতোই ব্যবস্থা, ফলের রস কালো সাদা রুটি মাখন চীজ জ্যাম জেলি সসেজ অমলেট দুধ চা কফি। লাঞ্চ ও ডিনারে সব রকম খাবারের ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয়দের পক্ষে অসুবিধা হবার কথা নয়। ভাত অবশ্য মোটা চালের, স্বাদও অন্যরকম। চিকেন কারি, মাছ সব পাওয়া যায়। সুপের মধ্যে হাঙ্গারির গুলাশ খুবই বিখ্যাত। নুনদানি ও মরিচদানিতে, মরিচের বদলে লঙ্কার গুঁড়োর মতো লাল রঙের এক রকম পাউডার, তাতে না আছে ঝাল না আছে ঝাঁজ। তবে এই গুঁড়ো খাবারের স্বাদ নিশ্চয়ই বাড়িয়ে তোলে।

পরদিনও মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর কনকনে শীতের জন্যে শহরের চেহারা ম্রিয়মাণ। রাস্তায় কোথাও কোথাও জলকাদা। যেতে যেতে দেখলাম শহরের নানান দিকে নানান রকম নতুন নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে। আমার প্রধান কাজ ছিল অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত একটি ছাপাখানা দেখতে যাওয়া। পৃথিবীর অনেক বড় বড় ছাপাখানা আগে দেখেছি, কিন্তু এ ছাপাখানার বিশালত্ব অনেক বেশি মনে হল। এই ছাপাখানাটি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। সারা হাঙ্গারিতে যত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা ছাপা হয় সব একত্র করলে যা হয় তার থেকেও বেশি ছাপার ক্ষমতা এই নতুন ছাপাখানার রয়েছে। এ দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি আকারে হয় ছোট, পাতার সংখ্যা কম থাকে এবং বিজ্ঞাপন বলতে কিছু থাকে না। গ্রাহক-সংখ্যা এত বেশি যে টাকা-কড়ির ঘাটতি হয় না। এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছে শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ড্যানিয়ুব বা ডুনা নদীর তীরে। হাঙ্গারিতে ড্যানিয়ুব নদীকে 'ডুনা' বলা হয়।

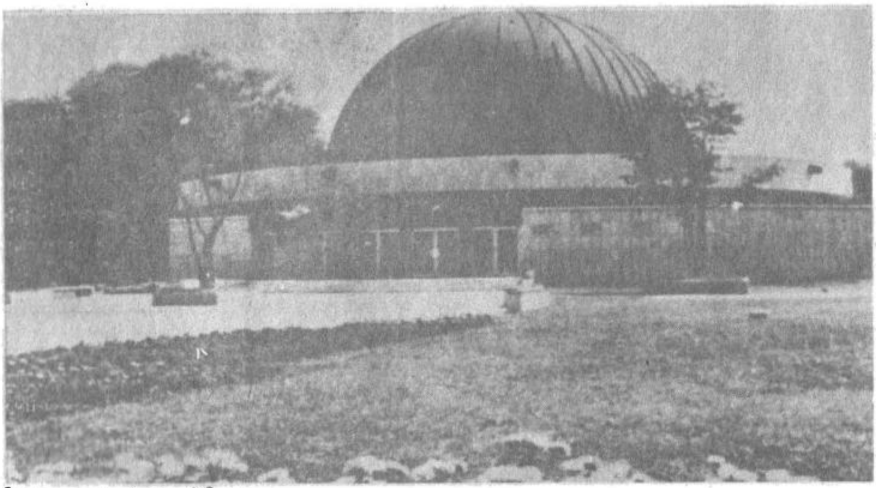

পিপলস পার্কে প্ল্যানেটারিয়াম

বুদাপেস্তের পথঘাট প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন। কলকাতার ট্রামের মতন ট্রাম, তবে কণ্ডাকটর নেই, ভিড়ও কম। পশ্চিমী সব দেশেই কণ্ডাকটর-ছাড়া ট্রাম। ট্রামে উঠেই টিকিট করে নিতে হয়। বাসগুলি অতি সুন্দর। ভূগর্ভ রেলের একটি টার্মিনাল আমার হোটেলের কাছেই ছিল। সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে বিরাট চত্বরে মাটির নীচে গড়ে তোলা হয়েছে একটি সুন্দর আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট। এক ফোরিন্ট মুদ্রা দিয়ে ভূগর্ভ ট্রেনের প্লাটফর্মে ঢুকে যে-কোনো দূরত্ব পর্যন্ত যাওয়া যায়। কোনো টিকিট চেকার বা কালেকটর নেই। ঢোকার মুখের মেশিনে ওই মুদ্রাটি না ঢুকিয়ে যদি কেউ প্লাটফর্মে যাবার চেষ্টা

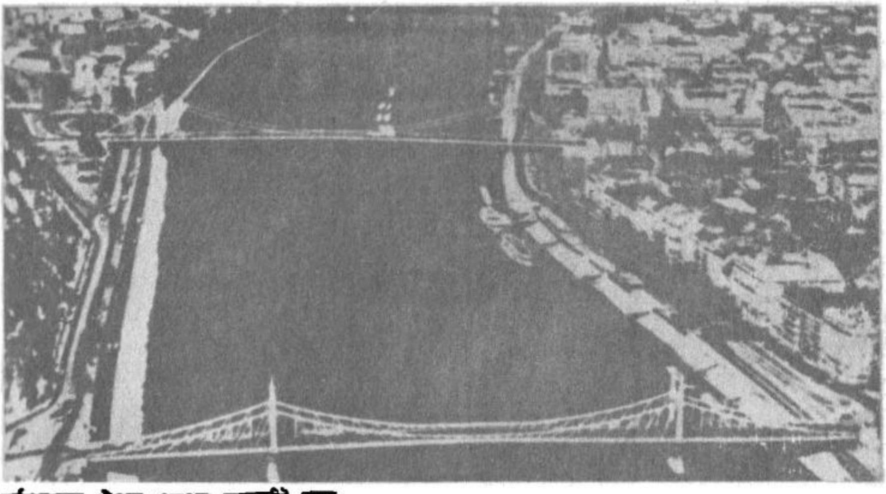

ড্যানিয়ুবের উপরে পরপর কয়েকটি সেতু

করে তাহলে টিভি স্ক্রীনে তা ধরা পড়ে যাবে, ইলেকট্রনিক গেটও খুলবে না। যাত্রীরা খুব সুশৃঙ্খল। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, টোকিও ও প্যারিসে যে কোচ দেখেছি এখানকার কোচগুলি তার থেকে অনেক সুন্দর।

বুদাপেস্ত শহরটি হাঙ্গারির সমতলভূমির প্রবেশদ্বার—ড্যানিয়ুব নদীর ধারে গড়ে উঠেছে। ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ছিল কুড়ি লক্ষ। শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশও খুব সুন্দর। মধ্য ইউরোপে বুদাপেস্তকে সবচেয়ে বড় শহর বলা হয়। এখানে অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আছে।

হাঙ্গারির বড় বড় রাজপথ ও রেলপথ এই শহরে এসে মিশেছে। হাঙ্গারির ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে যাতায়াতের খুবই সুবিধে। বুদা এবং পেস্ত দুটি জেলা একত্রে মিলে গড়ে উঠেছে এই শহর। সরকারি দফতরগুলির প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও বুদাপেস্তে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। ড্যানিয়ুব নদী অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। সেই সব রাষ্ট্রের ড্যানিয়ুবের জলসংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য এখানে ড্যানিয়ুব নদী কমিশনের প্রধান দফতর রয়েছে। শহরের আশেপাশে গড়ে উঠেছে আরো প্রায় ৫০টি ছোট ছোট কলকারখানায় ভরা জনবসতি।

১৮৭২ সাল থেকে শহরের এই নাম। পেস্ত ড্যানিয়ুব নদীর বাম তীরে আর বুদা ড্যানিয়ুব নদীর ডান তীরে এবং পুরনো বুদা শহরকে মিলিয়ে দিয়ে তখন একটি শহর গড়ে তোলা হয়। হাঙ্গারির জনসংখ্যার প্রায় কুড়ি শতাংশ এই শহরে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই শহর খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রায় ৯০ শতাংশ কলকারখানা ও ৮০ শতাংশ গৃহ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল। তারপর নানান পরিকল্পনার দৌলতে গড়ে উঠেছে আজকের বুদাপেস্ত।

এখানে ড্যানিয়ুব নদীর মধ্যে একটা দ্বীপ আছে, নাম মার্গারেট। এই দ্বীপের

সেণ্ট গেলার্টের মূর্তি

মধ্যে একটি আকর্ষণীয় পার্ক তৈরি করা হয়েছে। ড্যানিয়ুব নদীতে আছে অনেক-গুলো উষ্ণ প্রস্রবণ। তাতে রয়েছে রেডিয়াম। প্রস্রবণগুলির উপর অনেক স্নানাগার গড়ে তোলা হয়েছে। জল গরম রাখার জন্যে আশেপাশে অনেক গুহা তৈরি করা হয়েছে। বুদার চারপাশ ঘিরে আছে পাহাড় আর পেস্ত আছে সমতলভূমিতে। ড্যানিয়ুবের ডান তীরে পাহাড়ের উপর লিবারেশান মিনারটি বিখ্যাত। শহরের প্রাচীন দুর্গে এখন হোটেল ও জাদুঘর গড়ে উঠেছে। ক্যাসেল হিলে আছে রাজপ্রাসাদ। সেখানেও গড়ে উঠেছে একটি জাদুঘর, লাইব্রেরি ও শিল্প গ্যালারি। আর আছে মৎস্যজীবীদের রেস্তোরাঁ। এই হিলের উপরে দাঁড়ালে দেখা যায় শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে শান্তির প্রতীক রুপালি রেখার মতো ডুনা নদী। হিলের পাশেই গড়ে উঠেছে হাল ফ্যাশানের নামী হোটেল হিলটন। কাচের বাহার এমনই যে ক্যাসেলের পুরো ছবিটাই কাচের উপর পড়ে, কাচের মধ্যে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না। এই ক্যাসেলে কিছু কক্ষের লোহার গরাদে তালা লাগানো আছে—পুরনোকালের ফাঁসি দেওয়ার সরঞ্জামে ভরা। শহর-পরিক্রমার জন্যে গাড়িতে যেতে যে মজার ব্রিজটি নজরে পড়ে সেটিকে 'চেন ব্রিজ' বলে। ব্রিজের মুখেই রয়েছে প্রহরীর প্রতীক দুটি সিংহের বিরাট প্রস্তরমূর্তি। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল 'ম্যাহিয়াম চার্চে' যার কারুকার্য অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের বিশিষ্ট চার্চের তুলনায় অনেক উঁচু-মানের। চার্চের অপর পাশেই 'সেণ্ট স্টিফেন্সের' সুবিখ্যাত বিরাট মূর্তি। নদীর আর-একটা ব্রিজের প্রবেশমুখে গোল ধনুক-আকৃতি গেটের উপরে বিখ্যাত 'স্ট্যাচু অব গ্যালার্ট' যেন শহরে নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখেছি সুন্দর বাঁধানো বিরাট চত্বর যেখানে প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হতে পারে, সেই মিলানিয়াম মনুমেন্টের পাদতল।

জন হিল হল বুদাপেস্তের সব থেকে

বাঁয়ে হোটেল হিলটন, ডাইনে দুর্গ

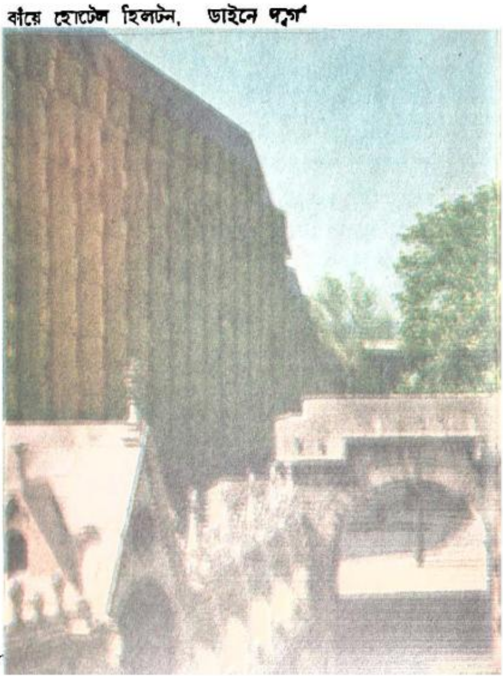

উঁচু জায়গা। এর উপর একটা মিনার তৈরি করা হয়েছে। সেই মিনারে উঠলে সমস্ত শহরটাকে পাখির চোখে দেখা যায়।

বুদাপেস্তের আয়তন ৫২৫ বর্গ-কিলোমিটার। এর ৪০ শতাংশ জুড়ে আছে ঘর-বাড়ি বাকি অংশে আছে বনভূমি, পার্ক ইত্যাদি। সিটি পার্কে বুদাপেস্তের আন্তর্জাতিক মেলা হয়। আন্তর্জাতিক মেলা ও কৃষিমেলার জন্যে বুদাপেস্ত পৃথিবী-বিখ্যাত।

বুদাপেস্তে আছে হাঙ্গারিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়ান্স, বিশ্ববিদ্যালয় আর অনেক কলেজ। এখানকার ১৮টি থিয়েটার ও ৩টি কনসার্ট হল খুব বিখ্যাত। একটা আধুনিক রাজধানী-শহরে যা-কিছু থাকা দরকার তার সবই আছে এখানে। পিপল্‌স স্টেডিয়াম খেলাধুলা ও বিশ্বপ্রতিযোগিতার পীঠস্থান। ফুটবল খেলা খুবই জনপ্রিয়।

অফিস বা কলকারখানা-ফেরত ট্রেনযাত্রী-দের স্টেশনের কাছাকাছি জায়গায় প্রায় পর পর বসে থাকা লটারি খেলতে দেখে মনে হয়েছে যেন এটা একটা আবশ্যিক খেলা। প্রায় প্রতিটি যাত্রী মস্ত বড় বড় ট্রেতে সাজানো ছোট-ছোট খামের মধ্যে থেকে ৫ ফোরিন্টের

প্রাচীন আমলের গির্জা। সামনে সেন্ট স্টিফেনের মূর্তি

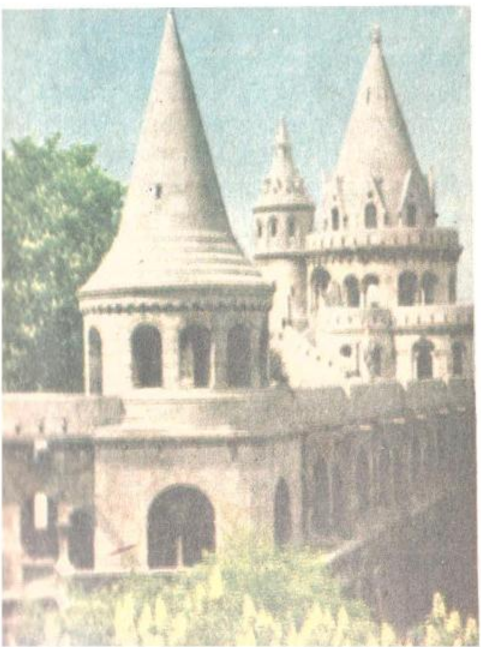

বিনিময়ে একটি খাম নিয়ে একটি ড্রামে ফেলে ড্রাম ঘুরিয়ে যে-কোনো একটি খাম খুলে দেখছেন, কিছু না উঠলেও কেউ হতাশ হচ্ছেন না, আবার খাম খুলে ৫০ ফোরিন্ট পুরস্কারের টিকিট পেলেও কারো মুখের কোনো ভাবান্তর দেখিনি। ১৮৯০ সালে একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারের ডিজাইনে তৈরি দুরপাল্লার রেলওয়ে স্টেশনের গমগমে বিল্ডিং ও ভূগর্ভ রেলের সাবওয়েতে এই লটারি খেলা আধঘন্টার উপর দেখে অবাক লেগেছে, আমার মনে হয়েছে যাত্রীদের কেউ বোধহয় এই খেলাটি না খেলে বাড়ি ফেরে না।

পথ চলতে টুকিটাকি খাবার হিসেবে ভুট্টাভাজা, বাদামভাজা বিক্রি হতে দেখেছি। খেয়ে দেখিনি, এমন কথাই বা বলি কী করে! আমাদের দেশের ভুট্টা কিংবা বাদামের চেয়ে যে ভাল, তা কিন্তু নয়।

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৬ ॥

আমি যে যুগে জন্মেছি সেটা ছিল অসহযোগের যুগ। গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগের মন্ত্র দিয়ে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন। বিদেশী সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হবে। তাঁর প্রভাব থেকে ছেলে - বুড়ো কেউ বাদ পড়েনি। প্রাথমিক স্কুল থেকে আরম্ভ করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমি ও আমার সমবয়সীরা সেই খাঁটি স্বদেশিয়ানার মধ্যে বড় হয়েছি। আমার মনে হয় বসু-বাড়ির যাঁরা কলকাতায় থাকতেন, তাদের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বেশি। এর কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র তো দেশের ডাকে আই সি এস ত্যাগ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দলে যোগ দিয়েছেন। বাবার সঙ্গে ছিল রাঙাকাকাবাবুর বিশেষ সম্পর্ক। বাবাও অল্পদিনের মধ্যে দেশবন্ধুর এক প্রধান সহযোগী হয়ে উঠলেন। আর বাবা ও রাঙাকাকাবাবু যাই করুন না কেন, তাতেই আমার মায়ের সায় ছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমাদের শিশুজীবন ও কৈশোর সব দিক দিয়ে স্বদেশী-প্রভাবিত ছিল। অবশ্য আমি এটা বলছি না যে বসু-বাড়িতে এর ব্যতিক্রম ছিল না।

গান্ধীজী দেশকে জাগিয়েছিলেন প্রধানত চরকা ও খদ্দরের মাধ্যমে। আমাদের বাড়িতে কোন ব্যাপারেই, ছোটদের বেলাতেও, খদ্দর ছাড়া কিছু চলবে না। সব জামাকাপড়, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়, ধুতি, শাড়ি, গায়ের চাদর, জানালা-দরজার পরদা, সবই খদ্দরের। সেকালে কিন্তু আজকালকার মতো মোলায়েম খদ্দর পাওয়া যেত না। মোটা খদ্দরের কাপড়জামা পরতে হত। বাবা কোর্টের পোশাকও খদ্দরের পরতেন। কোন বিশেষ কারণে সিল্ক পরতে হলে, সেটাও পুরোপুরি দেশী সিল্ক হওয়া চাই। আজও সেজন্য আমাদের কাছে খদ্দর এক বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পরিধান। আগেই তো বলেছি, বাবা-মা আমাদের নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন। সেকালে ভাল গরম কাপড় বেশির ভাগই বিলেত থেকে আসত। খুঁজে-পেতে পাঞ্জাবে বা কাশ্মীরে তৈরি গরম কাপড় যোগাড় করে মা আমাদের গরম কাপড়-জামা বানিয়ে দিতেন।

খদ্দর পরা ছাড়া বাড়ির যাঁরাই পারতেন চরকাতে বা তকলিতে সুতো কাটতেন। সেই সুতো দিয়ে আবার কাপড় তৈরি করতে দেওয়া হত। যাঁরা এটা পারতেন, তাঁরা বিশেষ গৌরবের অধিকারী হতেন। আমারও মনে আছে খানিকটা বড় হবার পর আমিও তকলিতে অনেক সুতো কেটেছি। তোমরা হয়তো ভাবছ আমি খদ্দর নিয়ে এত কথা বলছি কেন। বড় কথা হল যে, খাদি ও চরকার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেশের নবজাগরণের শরিক হয়েছিলাম। বিলেতি কাপড় পরা বা বিলেতি জিনিস ব্যবহার করা ছোট বয়স থেকেই আমাদের কাছে লজ্জার কথা বলে মনে হত। যাঁরা তা করতেন, তাঁদের আমরা কৃপার চোখে দেখতাম এবং আমাদের হিসাবে তাঁরা ছিলেন বিজাতীয়।

রাঙা-কাকাবাবু ১৯২৪ সালের শেষ থেকে ১৯২৭-এর প্রথম পর্যন্ত বর্মায় বন্দী ছিলেন। ঐ সময় তিনি বাবা-মাকে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে খদ্দর, সুতো-কাটা, কাপড় - বোনা সম্বন্ধেও তিনি খোঁজ-খবর নিতেন। এই সূত্রে বহু দিন পরের, ১৯৩৭ সালের একটা কথা মনে পড়ল। ততদিনে খদ্দরের ঝোঁকটা দেশে অনেকটা কমে এসেছে। তাছাড়া অনেক দেশী

মিলের কাপড়ও চালু হয়েছে। রাঙাকাকাবাবু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, এলগিন রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি, গায়ে একটি মিলের কাপড়ের শার্ট। সম্ভাষণের পর বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এবং শেষে গম্ভীর ভাবে বললেন, "কী, খদ্দর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাকি?" আমি আমতা - আমতা করলাম। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, পুরোপুরি খদ্দরেই ফিরে যাওয়া যাক।

আমাকে যখন কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করা হবে স্থির হল, তখনও পুরোপুরি দেশী কোনো স্কুলে ঐ বিভাগ চালু ছিল না। ভবানীপুরের মেয়েদের স্কুল ডায়োসেশনে আমাকে ভর্তি করা হল। ঐ মিশনারি স্কুলের নীচের কয়েকটি ক্লাসে অল্প সংখ্যায় ছেলেদের নেওয়া হত, এখনও হয় শুনেছি। স্কুলের কর্ত্রী তখন ছিলেন একজন জাঁদরেল মিশনারি মহিলা—ডরোথি ফ্রান্সেস। দেখলেই ভয় করত, ফলে স্কুলের ডিসিপ্লিন ভাল ছিল। শিক্ষয়িত্রীরা কিন্তু বেশির ভাগই বাঙালি ছিলেন এবং আমাদের খুব আদর-যত্ন করতেন। কলকাতার বহু অভিজাত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঐ স্কুলে পড়ত। সাহেবঘেঁষা ও কর্তা-ভজা পরিবারের অবশ্য অভাব ছিল না। তাঁদের জন্য কয়েকটি সাহেবি স্কুল ছিল।

রাঙা-কাকাবাবুকে আমার মা ডাকতেন 'ছোটদা'। ছোটদা তাঁর মেজবৌদিদিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে নিজের মতামত জানাতেন ও পরামর্শ দিতেন—সে তিনি জেলেই থাকুন বা বিদেশেই থাকুন। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে রাঙা-কাকাবাবুর মতামত খুব ব্যাপক, প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক ছিল। শিশুমনের যাতে সার্বিক বিকাশ হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য রাঙা-কাকাবাবু মাকে নানারকম পরামর্শ দিতেন। ডায়োসেশন স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য হাতের কাজ, গান-বাজনা, খেলাধুলো ইত্যাদির মোটামুটি ভাল ব্যবস্থাই ছিল। আমার মনে আছে আমি নিজে লেখাপড়ার চেয়ে হাতের কাজে বেশি আগ্রহী ছিলাম এবং ডায়োসেশনে প্রাইজ যা-কিছু পেতাম তা হাতের কাজের জন্য, লেখাপড়ায় নয়। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা

কার্শিয়াঙের বসু-বাড়িতে শরৎচন্দ্র, বিভাবতী ও ছেলেমেয়েরা। শরৎচন্দ্রের ডান পাশে লেখক শিশির (১৯২৬)

অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে এই ভেবে রাঙা-কাকাবাবুর পরামর্শে বাবা-মা ছবি আঁকা শেখাবার জন্য আমার খুব কম বয়সেই একজন মাস্টারমশাই রেখে দিলেন। আমার দিদি মীরাকেও কিছুদিন পরে ঐ শিক্ষায় আমার সঙ্গী করে দেওয়া হল। আমি কোনদিনও ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শী হতে পারলাম না, কিন্তু মাস্টারমশাই শ্রীহরেন সেনগুপ্ত আমার মধ্যে শিল্প ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে এমন একটা রুচি ও ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যেটা পরবর্তী জীবনে আমার খুব কাজে লেগেছে। আমাদের মাস্টারমশাইরা যে বাবা-মা'র কল্যাণে সহজেই আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে যেতেন তাই নয়, বাবা ও রাঙা-কাকাবাবুর দেশের কাজেও তাঁরা অংশীদার হতেন। যে হরেন সেনগুপ্তমশাই আমার শিশু বয়সের আর্টের শিক্ষক, তিনি বৃদ্ধবয়সে আজও নেতাজীর কাজ করে চলেছেন। আজকের নেতাজী মিউজিয়মের সব তৈলচিত্রই তাঁর আঁকা।

ছেলেবেলায় অসুখ-বিসুখ তো আমার লেগেই থাকত। মাঝে সেজন্য অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। মা হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার বই হাতের কাছে রাখতেন, আর থাকত একটা কাঠের বাক্সে সুন্দরভাবে

ডাবরের আমলা কেশতৈল আপনাকে অকৃত্রিম লাবণ্যে ভ'রে তোলে, তরঙ্গায়িত চিকন কালো কুন্তলে

নারীর রূপ-লাবণ্যের অর্ধেক হল—তার সুনিবিড় ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ চিকুর ।। এই সুবর্ণ সত্যের রূপদাতা —ডাবরের আমলা কেশতৈল ।। এটি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুলের মূলে গিয়ে পৌঁছয়, আর আপনার চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে ।। আস্তে আস্তে মসলে আপনার মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা রাখে ... আপনার কেশরাশিতে নিয়ে আসে ঝলমলে ভাব আর সজীবতা।। সুমিষ্ট গন্ধের আমেজের সঙ্গে সারাদিন ধরে আপনার কেশরাশি রাখে সুবিন্যস্ত।

চুলের প্রতি যত্নশীলা নারীদের কাছে ডাবরের আমলা কেশ তৈল যে খুবই প্রিয়, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মিষ্টি গন্ধ

ডাবর...প্রায় একশ' বছর ধরে আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সেবায়।

সাজানো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোটছোট শিশি। হোমিওপ্যাথিক গুলি তো খেতে ভাল, খেয়েছিও অনেক। কবিরাজী চিকিৎসারও বাড়িতে বেশ চলন ছিল। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও দাদাভাইয়ের বিশেষ সুহৃদ শ্যামাদাস বাচস্পতির কথা তো আগেই বলেছি। কবিরাজী ওষুধ তৈরি করতে হাঙ্গামা অনেক এবং সবক্ষেত্রে তা সুস্বাদুও নয়। কিন্তু মা ওষুধ ও রুগির পথ্য হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালে না বলবার উপায় ছিল না। অ্যালোপ্যাথিও চলত পাশাপাশি, কারণ আমাদের নতুনকাকাবাবু সুনীলচন্দ্র ছিলেন বিলেত-ফেরত ডাক্তার। তিনি নিজে তো আছেনই, অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞ বন্ধুদেরও প্রয়োজনমতো হাজির করতেন।

বাড়ির অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে, বিশেষ-করে ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে, রাঙা-কাকাবাবুর মতামত ছিল বিজ্ঞানধর্মী। যেমন ধরো, আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে এবং ক্রমাগত তেতো কুইনিন মিকসচার গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু মাকে লিখলেন, কেবল ওষুধ খাওয়ালেই তো চলবে না, রোগের মূল কারণ বের করে তার প্রতিবিধান করতে হবে। বললেন, বাড়িতে মশার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করুন। দিদির হল টাইফয়েড, রাঙা-কাকাবাবু বলে পাঠালেন, বাড়িতে এত সংক্রামক রোগ কেন হয়, এ-বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। রাঙা-কাকাবাবুর নিজেরও অসুখ-বিসুখ কম করেনি। পরে ১৯৩৬ সালে আমাদের কার্শিয়ঙের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকবার সময় দেখেছি, আধা-ডাক্তারি ও গৃহচিকিৎসার বই পড়ছেন। কিছুদিন আগেই ইউরোপে তাঁর পেটে অপারেশন হয়েছিল। দেখলাম গল ব্লাডার বা পিত্তকোষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। তাঁর প্রায়ই সায়াটিকার ব্যথা হত, শরীরের এই বিশেষ নার্ভ সম্বন্ধে দেখলাম তিনি বেশ ওয়াকিবহাল। নানা রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর বেশ জ্ঞান থাকায় তাঁর আর একটি সুবিধা হয়েছিল। প্রয়োজন হলে জেলের কর্তৃপক্ষ বা পুলিসকে বেশ ধোঁকা দিতে পারতেন।

(ক্রমশ)

ছবির মজা

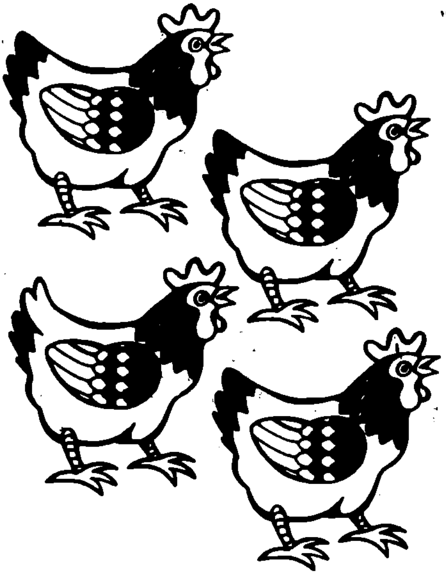

চারটে মোরগই কি একরকম?

(না, নীচের বাঁ-দিকের মোরগটির লেজ পুরোপুরি কালো নয়।)

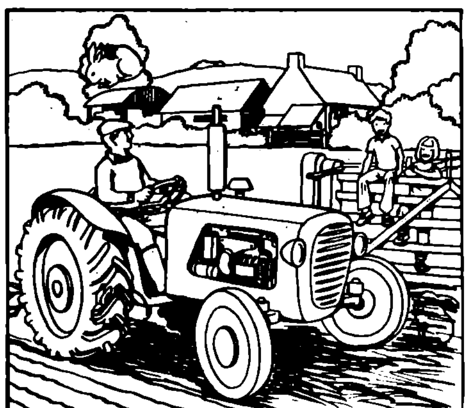

এই ছবির মধ্যে তিনটি খরগোশ লুকিয়ে আছে। তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে বলো, সে খুঁজে বার করুক। পারলে তাকে একটা লজেন্স দাও।

আস্তে আস্তে

হিমানীশ গোস্বামী

তেঁতুলমামার ঘাঁটির কাছে এসে সৌম্য তুষারকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, ভালমতো কিছু সমস্যা এনেছিস তো?"

সৌম্য বলল, "সে তোকে একেবারেই ভাবতে হবে না। এমন একটা সমস্যা পেলে তেঁতুলমামা খুশিও হবেন, আবার দুঃখিতও হবেন।"

সুপ্রকাশ বলল, "তেঁতুলমামার কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়।"

তুষার বলল, "অত কথায় কাজ কী, ঘাঁটিতে ঢুকেই পড়া যাক না কেন, তারপর দেখা যাবে তেঁতুলমামা সমস্যার সমাধান করতে পারেন কিনা।"

বেল টিপতেই স্যামু এসে দরজা খুলে দিল। অবশ্য হঠাৎ দেখলে স্যামুকে চেনা যেত না, কেনন এখন তার চেহারা একেবারে আলাদা। কোথায় গেছে তার কালো রঙ, একটু রোগা চেহারা, কালো চুল। তার বদলে এখন তার চেহারায় একটু কুঁজো ভাব। চোখের দু'কোণে কোঁচকানো চামড়া। আর দেখতেও একটু অন্যরকম। স্যামু দাঁত বার করে হাসল। বলল, "আসেন আসেন! আপনারা কতদিন না আসায় তেঁতুলমামা ব্যস্ত হচ্ছিলেন।"

তুষার বলল, "তা তোমার এমন চেহারা

হয়েছে কেন? হঠাৎ দেখলে মনে হয় চীনেম্যান। জনডিস-টনডিস হয়েছে নাকি?''

স্যামু একটু হেসে বলল, ''না, তা নয়—তেঁতুলমামা হুকুম দিয়েছেন যেদিন যেদিন চীনে খাবার রাঁধা হবে সেদিন সেদিন আমাকে চীনেম্যান সাজতে হবে।''

সৌম্য বলল, "কেন কেন?"

স্যামু বলল, ''তাহলে নাকি রান্নাটা চীনেদের মতো হয়। ওঁর ঐ রকম খেয়াল—যেদিন মোগলাই রান্না হয় সেদিন আমাকে মোগল সাজতে হয়, যেদিন হাঙ্গারিয়ান খাবার বানাই সেদিন আমাকে হাঙ্গারিয়ান সাজতে হয়। তেঁতুলবাবু আমার জন্য এগারো রকমের পোশাক বানিয়ে দিয়েছেন।''

এমন সময় খুদের দেখা পাওয়া গেল। সে এসে আগন্তুকদের চারদিকে ঘুরতে লাগল আর শুঁকতে লাগল। আর কিছু করল না। শুঁকে দেখে বুঝল এদের সঙ্গে আগে দেখা হয়েছে তার। আর এরা বাবুর পক্ষে বিপজ্জনক নয়।

এমন সময় তেঁতুলমামার হাঁক শোনা গেল, ''কেরে স্যামু?''

স্যামু বলল,"আজ্ঞে সেদিনকার সেই তিন বাবু।''

তেঁতুলমামা বললেন, ''ভেতরে আসতে বল।''

ওরা তেঁতুলমামার ঘরে গিয়ে দেখতে পেল তেঁতুলমামা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, তাঁর ঘরে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে আলো আসছে। তাঁকে ঘিরে চারটে পেডেস্টাল পাখা, চার কোণে। তেঁতুলমামার কাছেই একটা ছোট টেবিল। তার উপর স্তূপাকার করা বই খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, খাতা, লাল-নীল পেনসিল, কয়েকটা বলপয়েণ্ট পেন। পাখাগুলি কিন্তু একটাও ঘুরছে না। মাথার উপরে একটা সিলিং পাখা, সেটাও স্তব্ধ।

তেঁতুলমামা বললেন, ''এসো এসো। দ্যাখো, মাথা খাটিয়ে এই আশ্চর্য উপায় বার করেছি। ধরো তোমাদের খুব গরম লাগছে, দক্ষিণের হাওয়া চাই, বাস চালিয়ে দাও দক্ষিণ দিকের পাখাটা—অমনি ভলকে ভলকে হাওয়া আসবে দক্ষিণ দিক থেকে। আবার উত্তুরে হাওয়া চাই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়ার পাখা বন্ধ করে দিয়ে উত্তরের দিকটার পাখাটা চালিয়ে দিই। এইরকম চার রকম হাওয়ার জন্য চারটে পাখা। উপরের পাখাটার বিশেষ কাজই নেই। বলো আইডিয়াটা কেমন?''

ওরা সকলে বলল, "চমৎকার! চমৎকার!!"

তেঁতুলমামা এবারে বললেন, ''তোমরা কোনো সমস্যা-টমস্যা নিয়ে এসেছ তো?''

সৌম্য বলল, ''হ্যাঁ, এনেছি।''

তেঁতুলমামা বললেন ''চটপট বলে ফেলো তো সমস্যাটা। আর স্যামু—খুব চমৎকার করে বানাও তো প্রন-চৌ-মিয়েন!'' তারপর তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''স্যামুকে আজ দেখতে কী-রকম চীনেম্যানের মতো লাগছে না? এটা অবশ্য করতে হয়েছে ওর রান্নার উন্নতির জন্য। ও যতদিন পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চীনে খাবার তৈরি করত ততদিন সে খাদ্য মুখে তোলা যেত না। অবশ্য তাতে ক্ষতি ছিল না কিছু—আলসে সবই খেয়ে নিত। কিন্তু আলসের একার জন্য তো রান্না করা যায় না। তাছাড়া আমাদেরও তো খেতে হবে, কী বলো?''

সৌম্য বলল, ''কিন্তু আমি তো দেখেছি চীনেরা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আর পাজামা পরে রান্না করে, আর তা তো খেতে ভালই হয়?''

একথা শুনে তেঁতুলমামা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। বললেন, "যাক সে কথা। এখন তোমাদের সমস্যা কী?''

সৌম্য বলল, "পরীক্ষা এগিয়ে আসছে অথচ পড়াশুনা তেমন হচ্ছে না—একদম সময় পাচ্ছি না। রাত জাগলে পড়াটা হয়, কিন্তু রাত জাগতে পারছি না। খাওয়ার পর ঘুমে চোখ দুটো ঢুলে আসে। আবার সকালে যে উঠব তাও পারছি না। ভোর পাঁচটা কি চারটের সময় উঠতে পারলে তবু হত। কিন্তু পারছি না—এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন?''

তেঁতুলমামা এ-রকম একটা সমস্যার কী সমাধান বার করেন এ-বিষয়ে সৌম্য, সুপ্রকাশ এবং তুষারের কৌতূহলের অন্ত নেই। যদিও সমস্যাটা সৌম্য আগে বাকি দুজনকে বলেনি। কিন্তু সমস্যাটা বলার পর বাকি দুজনেরও মনে হল—হুঁ বাবা এ সমস্যার মতো সমস্যা বটে। এমন সমস্যা সমাধান করা কারুর সাধ্য নয়। তেঁতুলমামাই বা পারবেন কেমন করে?

সমস্যা শুনে তেঁতুলমামা বললেন, ''দাঁড়াও—আচ্ছা, আগে চা হোক! ওরে স্যামু, বাবুদের জন্য চা আর ...''

স্যামু একটা চাকা-লাগানো ট্রে-তে করে

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটার পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চে বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয় । কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

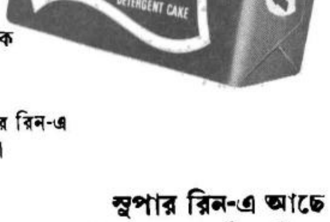

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

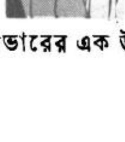

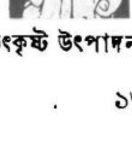

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে এল চিংড়ি দেওয়া চৌমিয়েন আর ফালি ফালি করে কাটা কুমড়ো, বেসনে ভেজে। পাশে একমা টী-পটে চা। এত তাড়াতাড়ি স্যাম্ এসব করে আনায় সৌম্যরা ভারী অবাক হল, আবার খুশিও হল।

কুমড়োভাজায় সবে তারা কামড় বসিয়েছে এমন সময় তেঁতুলমামার আওয়াজ পাওয়া গেল। "শোনো, একটা সমাধান বার করে ফেলেছি, তবে এটা ঠিকমতো করতে একটু সময় লাগবে। মানে, হিসেব করতে একটু সময় লাগবে, আবার এটা রূপায়ণেও একটু সময় লেগে যাবে। একটা কাগজ আর একটা পেনসিল দাও দেখি, হিসেবটা করি।"

তারপর হাতে পেনসিল নিয়ে কাগজের উপর হিজিবিজি কী-সব লিখলেন, অর্থাৎ যা লিখলেন তা দূর থেকে হিজিবিজি বলেই মনে হল।

এই সময় হঠাৎ খুদে অর্থাৎ আলসে ঘরে ঢুকে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

তেঁতুলমামা মিনিট দশেক ধরে হিসেব করলেন, কাটাকুটিও করলেন কিছুটা। তারপর বললেন, "সৌম্য, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে— কাজটা শক্ত নয়। প্রতিদিন তুমি কটার সময় শুতে যাও?"

সৌম্য বলল, "রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে।"

"আর সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠ?"

সৌম্য বলল, "সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে।"

তেঁতুলমামা কী একটুখানি লিখলেন। তারপর বললেন, "ও-রকম অনির্দিষ্ট সময় নিলে হিসেবের অসুবিধে হয়।ধরো রাত দশটা পনেরোর সময় তুমি শুতে যাও। এটাই ধরে নিতে এবং মানতে হবে। পারবে তো?"

সৌম্য বলল, "এ কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। নিশ্চয়ই পারব।"

তেঁতুলমামা বললেন, "আর ঘুম থেকে উঠতে হবে কাঁটায় কাঁটায় সোয়া সাতটায়।"

সৌম্য বলল, "আমার অ্যালার্ম ঘড়ি আমাকে ঠিক ঐ সময়েই জাগিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে আমার কী সুবিধে। আমার তাতে সময় বাঁচছে কেমন করে?"

তেঁতুলমামা বললেন, "তোমাকে ওটা করতে হবে প্রথম দিন। অর্থাৎ প্রথম দিন তুমি সকাল সাতটা পনেরোয় উঠবে, ঘুমুতে যাবে রাত দশটা পনেরোয়। তার মানে তুমি সমস্ত দিনে সব-কিছু করার জন্য সময় পাচ্ছ ধরো গিয়ে তেরো ঘণ্টা। এখন এই তেরো ঘণ্টার মধ্যে তুমি এটা-সেটা করা, চান-টান করা, খাওয়া, আড্ডা দেওয়া—এসবের জন্য খরচ করো চার ঘণ্টা, তাহলে বাকি থাকে ন'ঘণ্টা। এর মধ্যে অর্ধেক সময় যদি পড় তাহলে সময় পাচ্ছ সাড়ে-চার ঘণ্টা। কিন্তু সে সময় পর্যাপ্ত নয়, এই তো?"

সৌম্য বলল, "যা সিলেবাস তাতে আরও কয়েক ঘণ্টা বেশি দরকার।"

তেঁতুলমামা বললেন, "একারে তোমাকে দ্বিতীয় দিনে একটা কাজ করতে হবে। সকাল সাতটা বেজে পনেরো মিনিটে ঘুম থেকে না উঠে সাতটা বেজে চোদ্দ মিনিটে ঘুম থেকে উঠতে হবে।"

সৌম্য বলল, "সাতটা চোদ্দ মিনিটে উঠতে হবে? সে আর এমন শক্ত কী?"

তেঁতুলমামা বললেন, " আর শুতে যেতে হবে রাত দশটা বেজে ষোলো মিনিটের সময়। পারবে তো?

সৌম্য বলল, "চমৎকার। পারব না কেন?"

তেঁতুলমমা বললেন, "খুব ভাল কথা। এবারে তোমার নীট লাভ হল দু'মিনিট। অথচ তেমন কষ্ট করতে হল না, কী বলো?"

সৌম্য বলল, "না, কষ্ট কী?"

তেঁতুলমামা বললেন, "এইরকম দুদিন করলে। তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন তুমি ঘুম থেকে উঠলে সাতটা বেজে তেরো মিনিটে, শুতে গেলে দশটা বেজে সতেরো মিনিটে। তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে তুমি বেশি সময় পাচ্ছ চার মিনিট। এরপর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে তুমি সকালে উঠবে সাতটা বেজে বারো মিনিটে, এবং শুতে যাবে রাত দশটা আঠারো মিনিটে।

"তাহলে পঞ্চম এং ষষ্ঠ দিনে তুমি সময় বেশি পাচ্ছ ছ মিনিট। এভাবে উনত্রিশ এবং ত্রিশতম দিনে অর্থাৎ এক মাসের শেষে তুমি দিনে বেশি সময় পাচ্ছ আধ ঘণ্টা। এর মানে হল ঐ সময় তুমি সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠছ আর শুতে যাচ্ছ রাত দশটা ত্রিশে।"

তেঁতুলমামা এবারে খুব উৎসাহ পেয়ে গেছেন। বলে চললেন, "তারপর ধরো দ্বিতীয় মাসের শেষে তুমি সকাল পৌনে সাতটায় ঘুম

থেকে উঠছ আর শুতে যাচ্ছ রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে। তৃতীয় মাসের শেষে সাড়ে-ছটায় ঘুম থেকে উঠছ, শুতে যাচ্ছ এগারোটার সময়। এবার চতুর্থ মাসের শেষে তুমি পেয়ে যাচ্ছ আরও আধ ঘণ্টা সময়। পঞ্চম মাসের শেষে পাচ্ছ আরও আধ ঘণ্টা, এবারে সবসুদ্ধ হল গিয়ে আড়াই ঘণ্টা সময়। কেমন, ঠিক হচ্ছে তো?''

সৌম্য বলল, ''খুব চমৎকার। কিন্তু এভাবে করা সম্ভব হবে তো?''

তেঁতুলমামা বললেন, ''একদিনে করা সম্ভব নয় বলেই তো আস্তে আস্তে অভ্যেস করানো হচ্ছে, আস্তে আস্তে কথাটা মনে রাখা দরকার। এক সঙ্গে করলে যা হয় ভয়ানক, আস্তে আস্তে করলে সেটাই সহজ হয়ে আসে। আচ্ছা— আচ্ছা, তাহলে এক বছরের শেষে কী হবে?''

সৌম্য হিসেব করে বলল, ''এক বছরে অতিরিক্ত সময় পাচ্ছি ছ ঘণ্টা।''

"তার মানে"—তেঁতুলমামা বললেন, "ঐ সময়ে ঘুম থেকে উঠলে সোয়া - চারটেয় আর শুতে যাচ্ছ সোয়া-একটায়।''

এবারে তুষার বলল, ''আর এইভাবে নিলে দ্বিতীয় বছরের শেষে সময় পাওয়া যাবে অতিরিক্ত বারো ঘণ্টা। তখন সৌম্য শুতে যাবে সকাল সোয়া পাঁচটায়, আর ঘুম থেকে উঠবে আগের দিন রাত সোয়া এগারোটায়।'' বলে হি-হি করে হেসে উঠল।

তেঁতুলমামা বললেন, ''অতটা হবে কেন, তার আগেই থামতে হবে—এক বছরের পর সময়টা বেঁধে দিলেই হবে।''

কিন্তু তুষার তবু তার হাসি থামায় না। সে হাসতে হাসতে কেবলি বলতে থাকে, ''রাত সোয়া এগারোটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে —অথচ সৌম্য তখনও ঘুমুতেই যায়নি, আবার ঘুমুতে যেতে হবে সোয়া পাঁচটায়—কিন্তু তখন তাকে জেগেই থাকতে হবে। মানে একই সঙ্গে তাকে জাগতেও হবে, আবার ঘুমুতেও হবে! এ যে অসম্ভব ব্যাপার, হি হি হি!''

সেদিনকার আসর সেখানেই শেষ হয়ে গেল, কেননা তেঁতুলমামা এরপর আর একটি কথাও বললেন না। তিনি ঘরের পাঁচটা পাখাই একসঙ্গে চালিয়ে দিয়ে ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন।

ছবি মদন সরকার

॥ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ॥

কলকাতার রাস্তায় এখন অনেক সময়ই বড় বড় মেশিন দেখা যায়। আগে কিন্তু এগুলো দেখা যেতো না।

তারমধ্যে এক ধরনের মেশিনের নাম গালিপীট এম্প্টিয়ার বা ময়লা নিকাশী যন্ত্র। আগে মাটির তলার নর্দমার মুখগুলো পরিষ্কার করতো বাচ্চা ছেলেরা। বহুদিন ধরে এই নিয়মই চলে আসছিল। ফলে ঐ অন্ধকূপগুলোর ভেতর নেমে বিষাক্ত গ্যাসে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যেতো। কখনো কখনো ''গালিপীট'' পরিষ্কার করতে গিয়ে ছেলেদের কেউ কেউ দৈবাৎ মারাও গেছে। তাছাড়া অসুবিধেও আছে মানুষ দিয়ে এই সব কাজ করার।

এছাড়া জঞ্জাল সরাতে, ধাপাতে ময়লা নিয়ে যেতে, জমিকে সমান করতে (গ্রাউণ্ড লেভেল) বুলডোজার, ডাম্পার, পে-লোডার-ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আসলে কাজের ক্ষেত্রে এটা এক ধরণের আধুনিকীকরণ অথবা যন্ত্রের ব্যবহার বলা চলে।

সময় বদলাচ্ছে। যুগও। সেই যুগের তালে পা ফেলে চলতে হলে এটুকু যান্ত্রিকীকরণ দরকার। দরকার সময়ের প্রয়োজন মত পা ফেলে এগিয়ে চলার। পুরোনো প্রথাকে ত্যাগ করার।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

মোরগ-লড়াই

(মধ্য-জাভার রূপকথা)

মানসী দাশগুপ্ত

সে অনেকদিন আগের কথা। বানতেন রাজ্যের রাজার ছিল একটিমাত্র ছেলে, ছেলে তো নয় চক্ষের মণি, গলার ধুকধুকি, মাটিতে একদণ্ড নামালে তার ননীর অঙ্গে ব্যথা লাগবে বলে রাজা অস্থির হয়ে যান। কিন্তু এই সাধের ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়। কেন? আর কেন, ছেলে বাপের কথাও কানে তোলে না, বাপকে মান্যও করে না, কেবল দৌরাত্ম্য করে করে বেড়ায়। পৃথিবীতে একটিমাত্র কাজ সে শিখেছে তা হচ্ছে মোরগ-লড়াইয়ের খেলা, ঐ তার খেলা, তার সাধ আহ্লাদ, তার কাজ। মোরগ-লড়াই ছাড়া অন্য কোনো কাজে তার মন টানে এমন সাধ্য কার? সে আর কিছু করবেও না, শিখবেও না, ভাববেও না। তার যত মন ঐ মোরগ-লড়াইয়ে। শেষ পর্যন্ত এই বিগড়ে-যাওয়া ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা রাজা ঠিক করলেন তাকে রাজ্য-টাজ্য দেবেন না। ছেলেকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিলেন রাজা।

রাজপুত্তুর বাপের প্রাসাদ ছেড়ে তো বেরোল। হাঁটছে তো হাঁটছেই, হাঁটছেই। যেতে যেতে এক গহন বনে পৌঁছে গেল রাজপুত্র। খুব ক্লান্ত, রাত্তিরটা কোথায় কাটাবে ভাবছে এমন সময়ে তার নজরে এল অরণ্যের মাঝখানে ডাল-পাতায় ছাওয়া একটি কুটির, দিব্যি ছিমছাম। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে রাজকুমার ভাবছে কে এমন জায়গায় থাকতে পারে, এমন সময়ে কুটিরের দরজায় দেখা গেল খুব সুন্দর একটি মেয়েকে। রাজকুমার তার কাছে আসতে মেয়ে বলল এ কুটিরে সে থাকে একা। বাবা-মা দুই-ই তাকে একা রেখে মরে গেছে, তাই সে আর কী করবে? ওখানে থাকে আর নিজেই নিজের দেখাশোনা করে। এর পরে সেই গভীর বনের মধ্যে রাজ-কুমার আর সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরে বনের কুটিরে বউ নিয়ে তো রাজপুত্তুর সুখে আছে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। তারপরে বউয়ের সন্তান হতে যখন আর দু মাসও বাকি নেই, সংবাদ এল রাজার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রাজপুত্তুর। এবার রাজা হবে কে? তারই তো হবার কথা, কেননা, রাজার তো আর কোনো ছেলে নেই।

রাজপুত্তুর দেশের দিকে রওনা দিল। তাই না দেখে তার বউ কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু রাজকুমার বউকে বনেই রেখে যাবে। কিছুতেই সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে ফিরবে না। বউ বেচারা খানিক রেগেমেগে ঝগড়া করল, তাতেও কোনো কাজ হল না। কান্না, মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি কিছুতেই কিছু হল না। ঐ অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে রাজপুত্তুর রাজ্যে ফিরে গেল।

অল্পদিন পরে, কুঁড়েঘরখানির সামনে বসে বউ আপনমনে নিজের ভাগ্যের কথা, ভবিষ্যতের কথা, আকাশ-পাতাল ভাবছে, মাথার ওপর দিয়ে একটা ঈগলপাখি উড়ে গেল, পাখির ঠোঁটে চেপে ধরা রয়েছে এতটুকু একটি মোরগছানা। ঠিক বউটির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ঈগল ঠোঁটদুটি ফাঁক করল, আর মোরগছানা টুক করে এসে পড়ল বউয়ের পায়ের কাছে। ছানাটার লাগলে কী হবে, মরেনি। বউ তো তাড়াতাড়ি ছানাটাকে তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগল।

এর দু'চারদিন বাদেই বউয়ের খুব সুন্দর, মোটাসোটা ছেলে হল, তার নাম হল পানজি কেলারাস্। এ নাম কিন্তু বউ দেয়নি তার ছেলেকে, এ নাম দিল ঐ বাচ্চা মোরগটা। হল কি, বাচ্চা মোরগ তো চিরকাল বাচ্চা থাকে না, বউয়ের সেবাযত্নে সে ধর-ধর করতে করতে বড় হয়ে উঠেছিল। ছেলে যতদিনে আট-ন বছরের ছেলে হয়ে উঠেছে, মোরগ ততদিনে একেবারে দারুণ ঝুঁটিওয়ালা লড়িয়ে মোরগ হয়ে বসে আছে। ছেলে মায়ের কাছে জানতে চায়, "মাগো, আমার বাবা কোথায়?"

মা বলেন, "এইটি জেনে রাখো বাছা, বাপ নাই তোমার।"

ছেলেও এর পরে আর একটি কথাও জানতে চায় না, মা-ও টুঁ-শব্দ উচ্চারণ করেন না।

কিন্তু মোরগ ছড়া কেটে হেঁকে ওঠে:

"ক'ককো-ক'কর-কো,
ক'ককো-ক'কর-কো.
মৈ তুমহারা হো,
পানজি কেলারাস নাম

তোর/মা তো থাকেন বনের কুঁড়েয়
বাপ প্রাসাদেতে নিদ্ যান।"

এমনি করে মোরগের ছড়ায় ছেলের নাম হয়ে গেল পানজি কেলারাস।।

এদিকে সেই যে রাজপুত্তুর বউকে বনে ফেলে রেখে বাপের রাজ্য বুঝে নিতে গিয়েছিল, তার সাধ অপূর্ণ থাকেনি। দেশে ফেরার পরে এখন তিনি রাজামশাই। মৃত পিতার সিংহাসনে রাজমশাই বসেছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রজাবর্গ সব বুঝে গিয়েছে, নতুন রাজামশাই যে মোরগ-লড়াই ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রাসাদের বাগানে এখন মোরগ-লড়াইয়ের মুক্তাঙ্গন, প্রত্যহ সেখানে লড়াই দেখা আর দেখানো চলে। রাজ্যের আর সব কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা শিকেয় তোলা আছে।

গভীর অরণ্যে পানজি কেলারাসের কানেও এই রাজামশায়ের খ্যাতি পেঁছিল, প্রত্যহ রাজামশাই লড়িয়ে মোরগ নামান। পানজি কেলারাস ঠিক করল, তার নিজের পোষা মোরগটাকে নিয়ে প্রাসাদে যাবে আর রাজামশাইয়ের মোরগের সঙ্গে লড়াইয়ে নামাবে।

প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সে দেখে গোটা চত্বর লোকে লোকারণ্য, সবাই বাজি ধরছে। সে তখন মানুষজনকে ঠেলেঠুলে দাঁড়াল গিয়ে একেবারে মাঝখানে, আর বলতে লাগল তার মোরগ রাজার মোরগের সঙ্গে লড়তে চায়। একেবারে একটা ঢোক গেলা নেই, ভয়-ভাবনা নেই, লোকেরা শুনে ভিরমি খায়। প্রথমেই রাজার মোরগের ঝুঁটি ধরে টান? বলে কী ছেলে? এ-সব ভেবে তারা ভাল করে চেয়ে দেখল মোরগ হাতে ছেলেটাকে। মোরগটা সত্যিই তাক লাগানোর মতো, এ-কথাটা তাদের মানতে হল।

খেলা শুরু হওয়ার আগেই দু'পক্ষেই প্রচুর বাজি ধরাধরি হল। কিন্তু খেলা শুরু হয়েছে কি হয়নি, একটি ঠোক্করে রাজার মোরগ কাত। হেরে গিয়ে রাজার মোরগ পড়ে গেল। পানজি কেলারাসের মোগর গলা ছেড়ে হাঁক দিল :

"ক'কর...ক'কর কোঁ
মৈ কিসিকা হো। পানজি কেলারাসের
তার মায়ের কুঁড়ে পাতা ঘাসের
বাপ ঘুমোয় প্রাসাদে।"

উপস্থিত লোকজন একেবারে হাঁ। তাদের বিস্ময় কাটবার আগেই পানজি কেলারাস তার মোরগকে বগলে চেপে বনবাসিনী মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। শুধু তো মোরগ নয়, টাকাও এনেছে সে একথলি। তার মা চমকে উঠল। টাকা বটে তো? এত টাকা?

"কোথায় পেলি এত টাকা?" জানতে চাইল মা।

যেন প্রত্যহ সে থলেভর্তি টাকা এনে মাকে দিয়েই থাকে, এমনি সুরে পানজি কেলারাস জবাব দিল, "ওই টাকাটা? ও তো রাজার মোরগের সঙ্গে আমাদের মোরগটাকে লড়িয়ে দিয়ে জিতেছি। কিছু ভেব না মা। পরশুদিন গিয়ে আবার জিতে আসব।"

দ্বিতীয়বার প্রাসাদে গিয়ে পানজি কেলারাস প্রথমবারের চেয়েও বেশি ভিড়

পেল। এক আশ্চর্য মোরগ আর খুদে মোরগ-ওয়ালার গল্প মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল এই দুদিনে। সবাই এসেছিল দলে দলে তাদেরই দেখতে। রাজামশাই উপস্থিত হয়ে দেখলেন সমস্ত মনোযোগ ঐ পানজি কেলারাস ছোকরার ওপর। দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। গোমড়ামুখে বললেন, "ওহে ও ছেলে, এই একথলি স্বর্ণমুদ্রা রইল আমার বাজি, তুমি জিতলে এই পুরো থলি তোমার। হারলে তুমি কী দেবে?"

পানজি কেলারাস সোজা উত্তর দিল, "আমার এই মাথা। আমার মোরগ যদি হারে, আপনি আমার মাথাটা কেটে নেবেন।"

জনতা স্তম্ভিত! রাজামশাইও অবাক। তাঁর বড্ড কৌতূহল হচ্ছে, কে এই আশ্চর্য ছেলেটা! মুখখানা কেমন যেন চেনা-চেনা। কে হতে পারে ছেলেটা?

যাই হোক, রাজামশাই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ মোরগটিকে আনতে বললেন। এ-মোরগের জুড়ি নেই। কিন্তু, কী কাণ্ড, ঠিক আগের-বারের মতোই একটি ঠোক্কর খেতে না-খেতে রাজার মোরগ কাত। রাজামশাই এবং তাঁর রাজত্বের অহঙ্কার ভূলুণ্ঠিত। আর লড়াই করেন কোন মুখে? ওদিকে পানজি কেলারাসের মোরগ হেঁকে উঠেছে ঃ

"কঁকর...কঁকর কোঁ...
মৈ কিসিকা হো? পানজি কেলারাসের
তার মায়ের কুঁড়ে পাতা ঘাসের
বাপ ঘুমোয় প্রাসাদে।"

আগের বারের মতোই রাজামশাই এবং উপস্থিত সকলে হতবাক।

পানজি কেলারাসের লক্ষ নেই এ-সব দিকে। মোরগটিকে তুলে বগলে চেপে সে গিয়ে উপস্থিত মায়ের কাছে, মা বুকে টেনে নিয়েছে তাকে। দু'জনের কেউই নজর করেনি যে, রাজামশায় স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন সেখানে।

আসলে হয়েছে কি, রাজামশাই আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি। ছেলেটা কে, কোথায় থাকে—বের করার জন্যে তিনি তার পিছু নিয়েছিলেন।

রাজামশাই দেখলেন, তাঁর সেই বনে ফেলে যাওয়া বউই পানজি কেলারাসকে বুকে টেনে নিয়ে সোহাগ করছে। আবেগ চেপে রাখতে না পেরে তিনি ছুটে গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "ও বউ, বউরানী, এই দেখ আমিও ফিরে এসেছি তোমার কাছে। আমায় মাফ করবে?''

এই মাপ চাওয়া-চাওয়ি দেখে পানজি কেলারাস অবাক হয়ে গেল। রাজামশাই থতমত খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ''বউরানী, এই ছেলেটি কে?"

বউ বলল, "প্রভু, এটি তোমারই পুত্র।"

রাজা তখন মহাসমাদরে ছেলে আর বউকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। বনবাসিনী বউকে রানীর আসনে বসালেন রাজা। খুব সুখে দিন কাটতে লাগল সবার।

অনেকদিন পরে রাজামশাই গত হলে তাঁর আসনে বসল পানজি কেলারাস।

ছবি সুনীল শীল

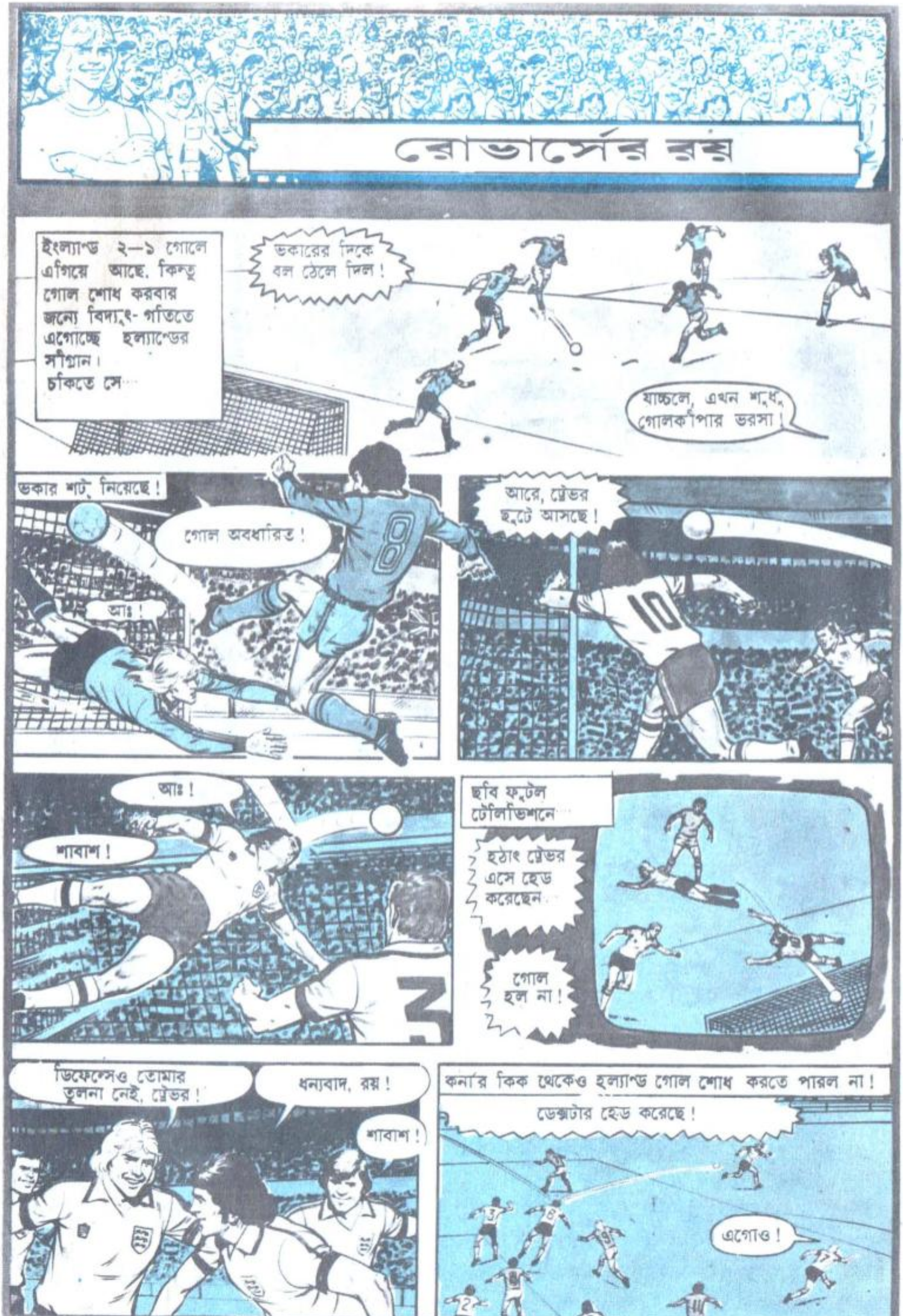
রোভার্সের রয়
ইংল্যান্ড ২—১ গোলে এগিয়ে আছে, কিন্তু গোল শোধ করবার জন্যে বিদ্যুৎ-গতিতে এগোচ্ছে হল্যান্ডের সীগ্রান। চকিতে সে…
ভকারের দিকে বল ঠেলে দিল!
যাচ্ছলে, এখন শুধু গোলকীপার ভরসা!
ভকার শট্ নিয়েছে!
গোল অবধারিত!
আঃ!
আরে, ট্রেভর ছুটে আসছে!
আঃ!
শাবাশ!
ছবি ফুটল টেলিভিশনে…
হঠাৎ ট্রেভর এসে হেড করেছেন…
গোল হল না!
ডিফেন্সেও তোমার তুলনা নেই, ট্রেভর!
ধন্যবাদ, রয়!
শাবাশ!
কর্নার কিক থেকেও হল্যান্ড গোল শোধ করতে পারল না!
ডেক্সটার হেড করেছে!
এগোও!

গাইলস রেসকে
রেস ভার্ননকে বল দিয়েছেন !
হল্যাণ্ড পিছিয়ে যাচ্ছে !
ইংল্যাণ্ড !
ইংল্যা……ণ্ড !
ভার্নন ভিতরে ঢুকে পড়েছেন !
ভার্নন এগোচ্ছেন……
এবারে বল ঠেলবেন……
গোল-পোস্টের সামনে,
ডান দিকে থেকে এগোচ্ছেন !
ট্রেভর ! কোথায় তুমি ?
এই তো !
৩—১
গোল !
গো-ও-ও-ল !
ট্রেভর গোল বাঁচাল !
তারপর নিজেই গোল করল !
আরে, এ কি আমার একার চেষ্টায় হয়েছে ?
ইংল্যাণ্ড এখন দুর্ধর্ষ !
ম্যাকডোনাল্ড ভীষণভাবে এগোচ্ছেন !
দেখা যাক কী হয় !
ফাউল !
উঃ !
ম্যাকডোনাল্ডকে মেরেছে !
পেনাল্টি !
হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল !
ট্রেভর, তুমিই শট নাও !
কিন্তু..
বল আটকে দিয়েছেন গোলি !
কিন্তু বল ফিরে আসছে !
এর পরে আগামী সংখ্যায়

কুট্‌স! কুট্‌স!
জোরিনোর টুপির গন্ধ শুঁকে বল যে, সে কোন্ দিকে গেছে!
এসো ক্যাপ্টেন!
ভৌ! ভৌ!
একটু আস্তে চলো!
দু' ঘন্টা বাদে....
ওই তো ওরা!
আমাদের নীচের পথ দিয়েই যাবে!
পাকদণ্ডি বেয়ে ওদের ঠিক পিছনে গিয়ে নামব।
নামতে গিয়ে মারা না পড়ি!
বাপ্‌স, এ যে ভীষণ খাড়াই!
ক্যাপ্টেন! নিঃশব্দে নামো!
বাঁচাও!
?
!
?
ক্যাপ্টেন উঠেছে! কিন্তু ধরা পড়বে!
শেষে লোকটাও এগিয়ে গেল!
অত হল্লা কিসের?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আগে যা ঘটেছে : রুকু-সুকু দুই ভাই। যেমন ঝগড়া, তেমনি ভালবাসা। বাবা ডাক্তার। ডালটনগঞ্জে বাংলো-বাড়ি। কুকুরের নাম অ্যালবার্ট, বেড়ালের নাম পেলে। অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়তে-পড়তে ইজি-চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ায় রুকু চোট পেয়েছে। তারপর—

॥ ৩ ॥

রাত তখন কটা হবে বলা শক্ত, তবে চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে, একটু পরেই নেমে যাবে থাক-থাক পাহাড়ের কোলে। রুকুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের কোণে খাটের পায়ের দিকে একটা খস-খস উসখুস শব্দ হচ্ছে। সুকুর বিছানা শূন্য। পাতলা মশারির ওপাশে পুবের জানালা। পুব আকাশে সরু-সরু আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। সেই আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বালিশ, অল্প অল্প কোঁচকানো চাদর, পায়ের দিকে জড়ো করে রাখা একটা চাদর, তার ওপর মহা আরামে ঘুমোচ্ছে সুকুর বেড়াল।

বালিশ থেকে মাথাটা অল্প একটু তুলে পায়ের দিকে তাকাতেই খসখস শব্দের কারণটা বোঝা গেল। মেঝেতে সুকু বসে আছে সোজা হয়ে। সামনে একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু। কখনও বড় হচ্ছে, কখনও ছোট। ধূপ। শেষ রাতে এমন দৃশ্য রুকু কখনও দেখেনি। ধূপ জ্বেলে ধ্যানে বসেছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। পরনে হাফ প্যান্ট। এদিকে শেষ - রাতের হাওয়ায় বেশ শীত-শীত করে। একটিমাত্র পাখি ঘুম ভেঙে একবার দুবার ডাকতে চেষ্টা করছে। ভাল পারছে না। চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে মনে হয়।

হঠাৎ আর এক ধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল। ফোঁ-ফোঁস। সুকুর পেছন দিকটা সোজা, ঘাড়, মাথা মেরুদণ্ড এক সরল রেখায় মেঝের ওপর খাড়া। নিশ্বাসের শব্দ। নেবার সময় বুকটা চিতিয়ে উঠছে, ছাড়ার সময় নেমে যাচ্ছে। এইভাবে শ্বাস নেওয়া আর ছাড়াকে বলে প্রাণায়াম। সুকু শেষ রাতে ধ্যান আর প্রাণায়াম শুরু করেছে। রোজাই করে, না আজ থেকেই শুরু হল। সুকুর ব্যাপার! মাথায় কখন কী ঢুকছে! কোথা দিয়ে কী বেরোচ্ছে! মা ঠিকই বলেন, মাঝে মাঝে ছেলেটার শিং বেরোয়।

রুকু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কোনও শব্দ করছে না। শব্দ করলেই সুকু হয়তো সতর্ক হয়ে যাবে। হঠাৎ বাঁ হাতটা রেডিওর এরিয়েলের মতো সোজা ওপর দিকে উঠে গেল। সেই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ রইল। ছেলেবেলায় বর্ণ পরিচয়ের বইতে "ঋ"র খোপে এই রকম হাত-উঁচু ঋষির ছবি থাকত, তলায় লেখা, ঋষি মশাই বসেন পুজোয়। সুকুকে দেখাচ্ছে, ঠিক যেন খুদে ঋষি।

সুকু প্রায় মিনিট পনেরো ওইভাবে হাত উঁচু করে বসে রইল। ধীরে ধীরে হাত নেমে এল। এইবার কী করবে? প্রণাম করছে। সুকুর ভগবান কে? মা কালী, দুর্গা, শিব, মহাবীর? কে জানে কে! সুকু উঠে পড়ল। মাথার বালিশের তোয়ালে-ঢাকাটা হয়েছিল সুকুর বসার আসন। মশারি তুলে চাপাটা বালিশে রেখে দিল। বেড়ালটার কপালে আঙুল ঠেকাল। যেন টিপ পরাচ্ছে। ঠোঁট নড়ছে বিড়-বিড় করে। মন্ত্র কিংবা কোনও প্রার্থনা চলছে মনে মনে।

সুকু এইবার রুকুর বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। রুকু শরীরটাকে আলগা করে শুয়ে রইল। ধরে না ফেলে জেগে আছে। মশারি তুলে রুকুর কপালে হাত ঠেকাল। হাতটা কিছুক্ষণ রইল। রুকুর হাসি পাচ্ছিল। শর্টস পরা বাবাজি। হাতটা উঠিয়ে নিজের কপালে ঠেকাল। মশারিটা সাবধানে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথার ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল।

বাগানের গাছে সেই পাখি দুটো এসেছে। ভোরের পাখি। রোজ ঠিক এই সময়ে আসে। পুব আকাশে সরু সোনালি সুতোর মতো আলোর রেখা দেখা দিলেই উড়ে চলে যায়।

অদ্ভুত দুটো পাখি। এ গাছে একটা, ও গাছে একটা। এ শিস দিয়ে বিশাল বড় একটা সেনটেন্স তৈরি করে যেই চুপ করল, সঙ্গে-সঙ্গে ও পাখিটা তার জবাব দিল। আবার এ ধরল, ও চুপ করে রইল। দুজনে কত কথাই যে বলে! গান না প্রার্থনা বোঝা শক্ত। বেশ বোঝা যায় দুজনে কথা বলছে। পাখির ভাষা রুকুর জানা নেই। ভোরের আকাশে সুরে সুরে ভরে যায়। কী পাখি আছে দেখতেই হবে। অদ্ভুত অসাধারণ কোনও ধার্মিক পাখি। ডালটনগঞ্জে এই প্রথম এসেছে।

রুকু উঠে পড়ল। পুবের জানালাটা সুকুর বিছানার দিকে। রুকুর কোমরের ব্যথাটা অনেক কমে গেছে। নেই বললেই হয়। বাবার ওষুধ আর হাতের কী গুণ! কেমন চট করে সেরে গেল। মেঝেতে দাঁড়িয়ে মা মা বলে রুকু বার কতক নেচে নিল। আমার মা, আমার বাবা। শুধু আমার কেন! আমাদের মা আমাদের বাবা।

পুবের জানালা ধরে রুকু দাঁড়িয়েছে। আকাশের গায়ে নতুন দিন। সূর্য, সূর্য আসছেন সাত ঘোড়ার লাল রথে চেপে। একদিন যদি দেখতে পেতুম তোমাকে। সুকু মাঝে-মাঝে আকাশে আশ্চর্য, আশ্চর্য জিনিস দেখতে পায়। গত বছর বর্ষার এক দুপুরে সুকু আকাশে টর্পেডোর মতো পর পর সাতটা উজ্জ্বল জিনিস যেতে দেখেছিল। মা কিছুতেই বিশ্বাস করেননি। বাবা বলেছিলেন অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমরা কজনই বা আকাশের দিকে ভাল করে তাকাই। রাত্তির বেলাটা তো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দি। সুকু দেখতে পায় রুকু কেন পায় না! সুকুর ওপর ভীষণ হিংসে হয়।

নাঃ, পাখি দুটোকে কিছুতেই দেখা যায় না। কোথায় যে বসে আছে! শিস শুনতে পাচ্ছে, পাখি দেখতে পাচ্ছে না। একটা তিতির তীক্ষ্ন সুরে ডাকতে ডাকতে পাহাড়ের দিকে উড়ে গেল। সুকু এখন বাগানে, সঙ্গে অ্যালবার্ট। ও, সুকুর হাতে একটা বল। দুজনে খুব খেলা হচ্ছে। অ্যালবার্টটা পাঁই পাঁই করে ছুটছে। কী খেলতেই যে পারে! খেলার সময় মুখটা কেমন দুষ্টু-দুষ্টু দেখায়! মাঝে মাঝে দুজনেই ঘাসের ওপর খুব খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিচ্ছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে অ্যালবার্ট সুকুকে ধমকাচ্ছে। সেগুন গাছ থেকে একটা দুটো বড় পাতা ঝরে পড়ছে। শীত আসার খুব একটা দেরি নেই।

ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে ঘণ্টার টিং টিং শব্দ। একটা টাঙা আসছে। এদিকে বড় একটা আসে না। তাও এত সকালে। কে আসছে। রুকুদের বাড়ির কাছ। কাছি এসে গাড়িটা থামল। অ্যালবার্ট গেটের দিকে তাকিয়ে খুব ঘেউ ঘেউ করছে। সুকু দৌড়েছে, কে এল দেখতে।

রুকু ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে

বারান্দায় বেরিয়ে এল। মোরাম-ঢালা একটা পথ সোজা গেটের দিকে চলে গেছে। লোহার বড় গেটের বাইরে টাঙা দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াটা ন্যাজ নাড়ছে। চোখে দস্যু-সর্দারের মতো ঠুলি আঁটা। বসে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। পায়ের কাছে বড় স্যুটকেস। টাঙা-অলা বলছে, "হাঁ, এহি তো মুখার্জি সাহাবকা কোঠি হায়। ডাক্তার সাহাবকা।"

সুকু গেটের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। গেটের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে অ্যালবার্ট পটাক-পটাক করে ন্যাজ নাড়ছে। বৃদ্ধ সুকুকে জিজ্ঞেস করছেন, "দাদু, এই বাড়িতেই কি রাজ্যেশ্বরী থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বরী তো আমার মা।"

"আমি কে বলো তো?" টাঙা থেকে নামতে-নামতে বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্ন করলেন। সাদা প্যান্ট, সাদা বুশ শার্ট, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সুকু অবাক, অ্যালবার্টও অবাক।

রুকু ভেতরে চলে এল। মাকে খবর দিতে হবে তো! মা উঠে পড়েছেন। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করছেন দু'হাত তুলে। বাবা এখনও ওঠেননি। অন্যদিন ভোরেই ওঠেন. কাল বোধহয় অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। কিংবা টেলিস্কোপ। বাবার একটা টেলিস্কোপ আছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রুকু বললে, "মা, কী সুন্দর এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখবে চলো। এই লম্বা নাক, চোখে চশমা, সাদা চুল সাদা জামাকাপড়। তুমি কখনও তাঁকে দেখোনি।"

রাজ্যেশ্বরী বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। টাঙাঅলা স্যুটকেসটা নামাচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ মানুষটি। সুকু বলছে, "আপনি ভেতরে আসুন না, এই তো আমি কুকুরের গলায় বেল্টটা ধরে আছি। ও কিছু করবে না। একটু খালি চেটে দেবে।"

"ও বুঝি চাটলেই বুঝতে পারে শত্রু কি মিত্র।"

রাজ্যেশ্বরী প্রায় ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন, "বাবা, তুমি?"

"হ্যাঁরে আমি। কোনও খবরটবর না দিয়েই চলে এলুম। খুব অবাক হয়েছিস।"

"অবাক হব না, তুমি এই প্রথম এলে। কতবার আসব-আসব করেছ, আসনি।"

"এবার আমার শরীর আমাকে টেনে এনেছে।"

"শরীর! শরীর খারাপ নাকি!"

টাঙাঅলা হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করল, "নমস্তে ডাগদার সাব।"

বাবাও এসে গেছেন। টাঙাঅলাকে বললেন, "নমস্তে, ভাল আছিস।"

"হাঁ জি।"

"যা, স্যুটকেসটা ভেতরে নিয়ে যা। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।" নিচু হয়ে প্রণাম করলেন। রাজ্যেশ্বরীর খেয়াল হয়নি, তিনিও প্রণাম করলেন। রুকুকে বলতে হল না। সুকু বাঁ হাতে অ্যালবার্টের গলার বেল্ট ধরে আছে। সেই অবস্থাতেই ডান হাত বাড়িয়ে দাদুর পা ছুঁতে গিয়ে কেতরে মোরামের ওপর পড়ে গেল। অ্যালবার্টের ঘাড়ের ওপর সুকু। কুকুরের কেঁউ-কেঁউ আর্তনাদ। সুকু শুয়ে শুয়েই বলছে, "দাদু, প্রণাম।"

"হ্যাঁ দাদু। এমন প্রণাম আমি জীবনে দেখিনি।"

রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে ওঠাতে-ওঠাতে বললেন, "কুকুরটাকে ছেড়ে দে না। তোর কি সবই অদ্ভুত রে।"

"যদি কামড়ে দেয় মা?"

"কামড়াবে কেন?"

ডক্টর মুখার্জি দাদুকে নিয়ে বারান্দার দিকে এগোতে-এগোতে বললেন, "তুমি টাঙা-ভাড়াটা দিয়ে দাও।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"সে কী, আপনি দিলেন কেন?"

"বাঃ, আমি দোব না তো কে দেবে?"

রাজ্যেশ্বরী এগিয়ে গেছেন। রুকু আর সুকু পেছন পেছন আসছে।

রুকু বললে, "কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।" হঠাৎ সুকুর কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কী রে। রক্ত।"

"ও কিছু না। উলটে পড়ে গেলুম কিনা।"

"তুই পড়ে গেলি কেন?"

"ওই যে অ্যালবার্ট হ্যাঁচকা টান মেরে

ফেলে দিলে। আমার ভীষণ অপমান হয়েছে।''

''অপমান? কে অপমান করলে।''

"নিজেকেই নিজে অপমান করেছি। প্রণাম করতে গিয়ে পড়ে গেলে কী হয়। অপমান হয় না! আমি আর কথা বলব না।''

''কার সঙ্গে কথা বলবি না।''

"অ্যালবার্টের সঙ্গে।"

''বেশি কথা বলিসনি। এখন ওই জায়গাটায় ওষুধ লাগাবি চল।''

''আমি ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দোব।"

"কেন, ওষুধ লাগলে কী হয়।"

''সে তুই বুঝবি না। আমি যেখানে যাব সেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, দোকান নেই, বাজার নেই, শহর নেই, শুধু পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনা।"

"কবে যাবি?''

''তোকে বলব কেন? তুই আবার মাকে বলে দিবি।''

"ও, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না। ঠিক আছে।''

রুকু হন-হন করে সুকুকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। বাংলোবাড়ি যেমন হয়, চারপাশে ঢাকা বারান্দা। সামনের পথে যেমন ঢোকা যায় পেছনদিকের সুন্দর উঠোন দিয়ে রান্নাঘর, ভাঁড়ার, কলঘরের পাশ দিয়েও আসা যায়। রুকু সেই দিকেই চলে গেল। পেছনে একটা পিচ ফলের গাছ। সারা দুপুর ঠ্যাঙা-ঠেঙি করেও এখনও কয়েকটা পিচফল রয়েছে। রঙ ধরেছে। দু'একদিনের মধ্যেই তুলতুলে হবে। যত না খেতে ভালবাসে, তার চেয়ে দেখতে ভালবাসে রুকু। গ্রীষ্মের দুপুরে একটা পিচফল হাতে নিয়ে সেগুনের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকো। চারদিকে লু ছুটছে। আকাশের গায়ে তামাটে পাহাড়। একটা ভোমরা এলিয়ে পড়া ফুলের ইঞ্চিখানেক দূরে ভোঁ ভোঁ করছে। মাঝে মাঝে ছোঁ মেরে গর্ভকেশর থেকে পরাগ আর মধু তুলে আনছে। সেগুনের তলার ঝোপে এক ডাল থেকে আর-এক ডালে মাকড়সা ঝুলে ঝুলে জাল বুনে চলেছে। পিঁপড়ের সারি চলেছে পিঠে ডিমের বোঝা নিয়ে। এইটুকুটুকু সোনালি মাছি মায়ের নাকের নাকছাবির মতো ফিন-ফিন করে উড়ছে। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

গিরিধারীর বায়না

চিত্তরঞ্জন দেব

লালধারীর একরত্তি ছেলে
গিরিধারী
ঘুম তাড়িয়ে মায়ের সাথে
করে আড়ি।
ধোয় না সে মুখ, খায় না খাবার,
যায় না ঘরে
পাখির মতো চাই ডানা তার
বায়না ধরে।
রোদের পাহাড় পার হয়ে চিল
কোন্ দেশে যায়
সন্ধ্যাসায়র সাঁত্রিয়ে হাঁস
পালায় কোথায়?
আঁধার রাতে তারার বাতি
জ্বালায় কারা
চাঁদের সোনার খনিটা কে
দেয় পাহারা?
দেখতে চায় সে শূন্যে উঠে
আকাশখানা,
সেই কারণে পাখির মতো
চাই-যে ডানা।
ডানার বায়না ধরে কাঁদে
গিরিধারী
ঘুরে বেড়ায় বনবাদাড়ে
যায় না বাড়ি।

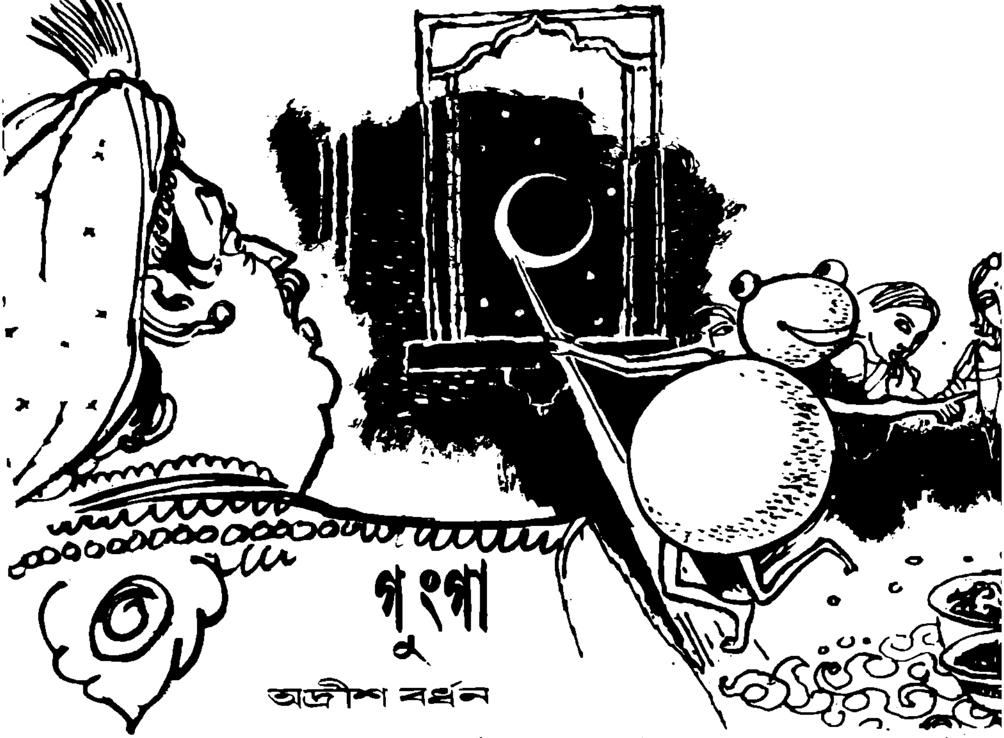

গুংগা

অদ্রীশ বর্ধন

উদ্ভট রাজ্যের রাজবাড়িতে আজ সবাই কব্জি ডুবিয়ে খেতে বসেছে। কেন? না, রাজকন্যাকে দেখতে এসেছে বিদ্ঘুটে রাজ্যের রাজপুত্র কুণ্ডালু।

পছন্দও হয়েছে। বিয়ের দিনটা এখন ঠিক করতে হবে। তাই সবাইকে নিয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপর আসন পেতে খেতে বসেছেন রাজা আর রানী।

জ্যোৎস্না রাত। জানলা দিয়ে ঝকঝকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

রাজা খেতে খুব ভালবাসেন। সুযোগ পেলেই তাই সবাইকে নিয়ে ভালমন্দ খান। কাউকে নেমন্তন্ন করতে ভোলেন না, এমন-কী ফুলপরীদেরও বাগান থেকে ডেকে এনে খেতে বসিয়ে দেন। সেদিনও পরীরা বসেছে এক লাইনে, মুখোমুখি বসেছেন রাজবাড়ির সবাই।

এমন সময় ঘটল সেই আশ্চর্য ব্যাপার।

চাঁদের মুখ ঢেকে গেল কালো মেঘে। মেঘ ফুঁড়ে একটা মাত্র সরু চাঁদের আলো জানলা গলে সটান এসে পড়ল রাজপুত্র কুণ্ডালুর সোনার বাটিতে। অবাক হয়ে সবাই দেখলেন, ভীষণ বেগে কে যেন চাঁদের আলোর স্লিপ বেয়ে পিছলে এসে ঝপাস করে পড়ল মাছের কালিয়ার বাটির ওপর।

তারপরেই মসলা-ঝোলের মধ্যে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাটির কিনারায় লিকপিকে পা ঝুলিয়ে বসল একটা অদ্ভুত জীব। মাথায় খুব জোর এক বেগত লম্বা। ধড়টা টেনিস বলের মতো, মাথাটা মুর্গির ডিমের মতো, তাতে পুঁতির মতো দুটো চোখ, আর মস্ত একটা হাঁ। সারা মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে যেন হাসতে হাসতে। টেকো মাথা থেকে লিকপিকে ঠ্যাঙ পর্যন্ত যেন সবুজ কুয়াশা দিয়ে মোড়া।

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, "কে তুমি?"

"গুংগা।"

"সে আবার কে?"

"চণ্ডীদাসের খুড়োকে জিজ্ঞেস কোরো। এক বছর বয়েসে সে আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল।"

"অ! কোথায় থাকা হয়?"

"চাঁদের উলটো দিকে—চাঁদিম দেশে।"

"অ! এখানে আসা হয়েছে কেন?"

"আমাকে নেমন্তন্ন করা হয়নি কেন?"

"তাই নাকি?" অবাক হওয়ার ভান করলেন রাজা—"চিঠি পৌঁছোয়নি বোধ হয়।"

"ফের ধাপ্পা!"

"অ! থাকগে, এসে তো গেছ। কালিয়ার বাটি থেকে নেমে বোসো, কন্ডালুর খাওয়াটা মাটি করে দিও না।''

''খাওয়াচ্ছি ভাল করে। গুংগাদের চেনো না এখনও।''

"চটছ কেন?"

''শোনো রাজা, আমরা গুংগারা খালি হাসি, হেসে হেসেই দিন কাটাই। প্রফেসর হেশোরাম হুঁশিয়ার যদি অভিযানে যেতেন চাঁদিম দেশে, আমাদের দেখতে পেতেন। আমরা হাসাইও বটে, কাঁদাতেও ছাড়ি না রেগে গেলে।''

''রাগ কোরো না, রাগ কোরো না, কী খাবে বলো?''

"পরীদের নেমন্তন্ন করেছ অথচ আমাদের বাদ দিয়েছ, ভাবছ ছেড়ে দেব?''

''দই-বড়া খাবে?''

"খাওয়াচ্ছি," বলেই টপাস করে কালিয়ার বাটি থেকে গুংগা লাফ দিয়ে উঠে গেল কন্ডালুর মাথায়। টুপ করে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে বললে, "আজ থেকে রাজপুত্রের মনে যা আসবে, মুখে তাই বলবে।"

বলেই, লাফ দিয়ে নামল চাঁদের আলোর স্লিপে, সাঁ করে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। সরে গেল কালো মেঘ।

রাজা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ''বাঁচা গেল! যত্তো আপদ!''

ফস্ করে রাজপুত্র বললে, ''আপদ আপনি। নিজে একপেটে গিলবেন বলে রাজ্যের ফালতু লোককে নেমন্তন্ন করেছেন।"

রাজা তো হতভম্ব! কন্ডালু ভারী মিষ্টি কথার মানুষ, সহবত জানে, মুখ দিয়ে কখনও কড়া কথা বেরোয় না। তাহলে? গুংগার অভিশাপ কি আরম্ভ হয়ে গেল?

রানী তাড়াতাড়ি বললেন, ''ছিঃ বাবা! ও বলতে নেই।''

খ্যাক করে কন্ডালু বললে, ''বুড়ি হয়ে আপনারও শখ কমেনি। মাথার চুল তো পাকছে, এত খিদে কেন?''

বেগতিক দেখে সবাই উঠে পড়ল আসন ছেড়ে। কন্ডালু বলে উঠল, ''যা-যা, ভাগ। হাঁকোমুখো হ্যাংলার দল।''

নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল ঘর।

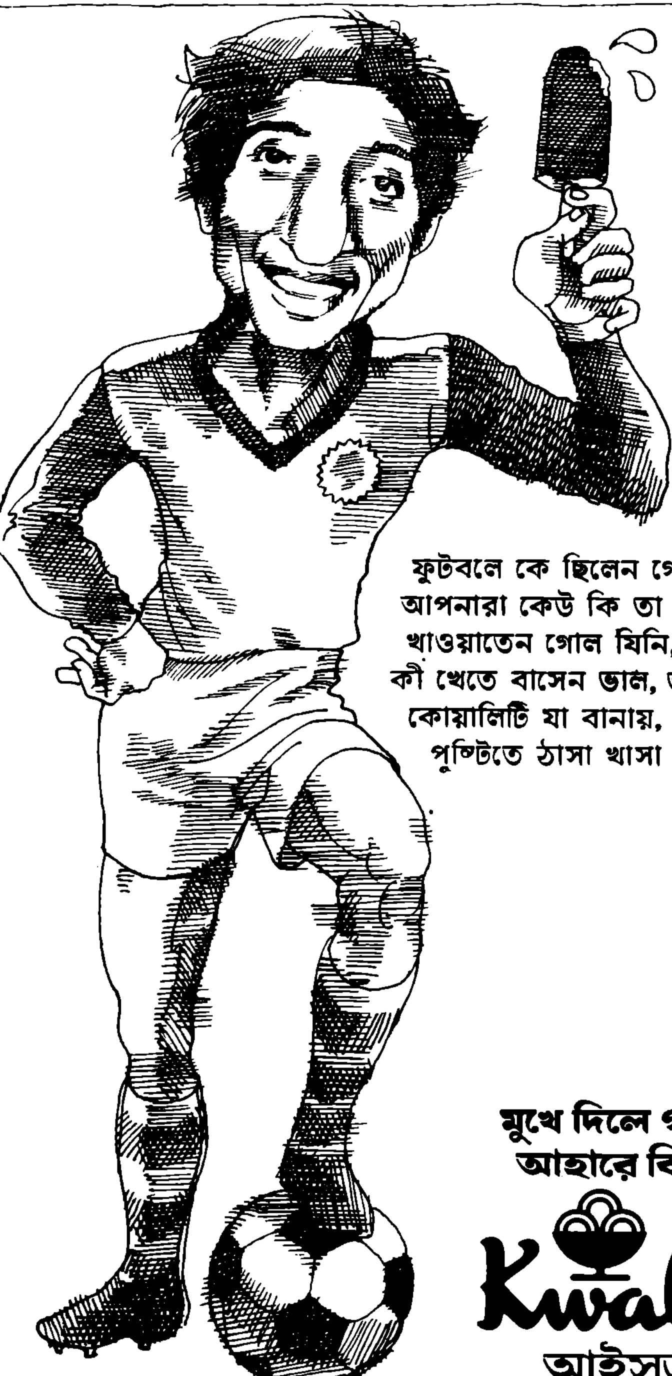

ফুটবলে কে ছিলেন গোলের গোসাঁই ?
আপনারা কেউ কি তা জানেন মোশাই ?
খাওয়াতেন গোল যিনি, সেই খেলোয়াড়
কী খেতে বাসেন ভাল, জানা আছে কার ?
কোয়ালিটি যা বানায়, চুনী খান তা-ই,
পুষ্টিতে ঠাসা খাসা ঠাণ্ডা মালাই ।

মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !

Kwality
আইসক্রীম

গংগার অভিশাপের কথা ছড়িয়ে গেল উম্ভট রাজ্যে। কম্ডাল যাকে পাচ্ছে তাকেই রাগিয়ে দিচ্ছে মনের কথা মুখে বলে ফেলে। সব সময় সত্যি কথা যে মুখের ওপর বলতে নেই, জেনেও সামলাতে পারছে না, মুখ শুকিয়ে গেল রাজা-রানীর। এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি যায়?

মুখ শুকিয়ে গেল রাজকন্যেরও। মনের দুঃখে একদিন বাগানে গিয়ে প্রাণের বন্ধু খরগোশকে ডেকে বলল সব কথা।

শাক খেতে খেতে সব শুনে খরগোশ বললে, "গুংগারা লোক ভাল, ওদের একটু নরম করে আসতে হবে।"

"কী করে?"

"পূর্ণিমা রাতে তুমি এলো চুলে খালি পায়ে এই মন্তরটা শুধু বলবে—

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

তাহলেই দেখবে চাঁদের রাস্তা খুলে যাবে। তারপর যা করার, তুমি গিয়ে কোরো।"

পূর্ণিমার রাতে জানলায় দাঁড়িয়ে এলো চুলে খালি পায়ে মন্তর পড়তেই চাঁদের বুক থেকে ঝকঝকে রাস্তা নেমে এল রাজকন্যের পায়ের গোড়ায়। তরতরিয়ে উঠে গেল রাজকন্যে, বড্ড পেছল আর ঠাণ্ডা বলে প্রথমটা একটু কষ্ট হলেও তারপর যেন অদৃশ্য কারা এসে ওকে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল চাঁদের পেছনে।

চাঁদের পেছন দিকটা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। রাজকন্যে দেখল, সেখানে শুধু সবুজ কুয়াশা তালগোল পাকাচ্ছে, কুয়াশার মধ্যে অসংখ্য গুংগা ডিগবাজি খাচ্ছে আর আহ্লাদী হাসি হাসছে। কোনও কারণ নেই। শুধু শুধু হাসছে। ফিকফিকিয়ে হাসছে, ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে, চোখ বুজে হাসছে, গায়ে চিমটি কেটে হাসছে, নাকের ভেতর নখ গুঁজে হাসছে, হাসি যেন ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে বেরিয়ে আসছে। ঐ জন্যেই বুক-পেট ওদের এত গোল, দেখতেও সবাইকে একরকম।

রাজকন্যেকে দেখেই একজন এগিয়ে এল হাসি থামিয়ে। জোর করে ভুরু কুঁচকে বললে, "চিনেছি তোমাকে। এখানে কী মনে করে?"

সেই গুংগা। যে অভিশাপ দিয়েছিল। রাজকন্যে তাড়াতাড়ি বললে, "তোমার জন্যে কি আমার বিয়েটা আটকে থাকবে?"

"বিয়ে!" যেন আকাশ থেকে পড়ল গুংগা। "বিয়ে করে কী হবে? এসেছ যখন, হেসে নাও প্রাণভরে," বলেই ফ্যা-ফ্যা করে হেসে উঠেই ফের গম্ভীর হয়ে গেল গুংগা। কিন্তু বুক-পেট থর-থর করে কাঁপতে লাগল হাসির দমকে।

রাজকন্যে বললে, "না, আমি বিয়ে করব। তুমি অভিশাপ ফিরিয়ে নাও।"

"ফিরিয়ে নেব!" মহা ভাবনায় পড়ল গুংগা—"সে পারে কেবল আমাদের রাজা। চলো, তার কাছে যাই।"

গুংগাদের রাজাও আর একটা গুংগা। মাথায় মুকুট-ফুকুট কিচ্ছু নেই। মস্ত সিংহাসনের এক কোণে গুটি-সুটি মেরে বসে ঘুমোচ্ছে। আর, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে খি-খি করে হাসছে।

"রাজা! ও রাজা!" গুংগা-প্রজা রাজার গায়ে ধাক্কা দিল।

"কে?...কে?...খি-খি-খি!" ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গুংগা-রাজা।

"অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে হবে।"

"তা কি হয়?"

"নিতেই হবে," রেগে গেল রাজকন্যে। "নইলে যে আমার বিয়ে হচ্ছে না।"

"তাই নাকি?—যাও তাই হবে। তবে—" বলেই খি-খি করে ফের হেসে গড়িয়ে পড়ল রাজা—"এখন থেকে মনের কথা মুখ দিয়ে বলার অভ্যেস তোমারই হবে, রাজপুত্রের নয়।"

চাঁদের পিছল পথ বেয়ে রাজবাড়িতে নেমে এল রাজকন্যে। এসেই দেখল রাজারানী হাসছেন। রাজপুত্র নাকি ভাল হয়ে গেছে। যাকে-তাকে যা খুশি আর বলছে না।

বিয়ে হয়ে গেল দুজনের, কিন্তু...

না...না...যা ভাবছ, তা হল না। রাজকন্যে মনে যা ভাবত, চিরকালই মুখে তাই বলত, বিয়ের পরেও বলে গেল, কেউ রাগল না।

কেন রাগবে? রাজকন্যের মনটি যে বড্ড ভাল। দুনিয়ার সব কিছুই তার কাছে ভাল, তার কথাও তাই খুব ভাল।

ছবি মাগন দত্তগুপ্ত

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■	৫	■		■
৬					৭	
■	■	৮			■	■
৯	১০	■		■	১১	
■		■		■		■
১২			■	১৩		

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) গঙ্গার বিখ্যাত উপনদী। (৩) বিখ্যাত বিমান-বন্দর। (৬) ভারতীয় মরুভূমি। (৭) একটি পর্বতমালা। (৮) তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদী। (৯) যে-নদী শুনতে ফলে। (১১) সার-কারখানার জন্য বিখ্যাত। (১২) নবীন পলিমাটি। (১৩) স্বাস্থ্যকর শহর, একটি রাজ্যের রাজধানী।

উপর-নীচ ঃ (২) এককালে গাদা-বন্দুক তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। (৪) ইরাবতী নদীর তীরে একটি রাজধানী শহর। (৫) কুলু উপত্যকার কোথায় উষ্ণ প্রস্রবণ আছে? (১০) একটি পবিত্র নদী। (১১) যে-রাজ্যের সিকি-অংশ বাদ দিলে এক-তৃতীয়াংশ থাকে।

শব্দ-সন্ধান ও ধাঁধার উত্তর পাঠাতে হবে না। নিজেদের তৈরি সমাধান পরের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বে	হা	লা	■	চ	শ	মা
তা	■	ফ	ট	ক	■	র্জা
র	■	■	লে	■	■	র
■	আ	র্কি	মি	ডি	স	■
কা	রা	■	■	■	সে	না
■	রা	ব	■	আ	মি	■
প	ত	ঙ্গ	■	ম	রা	ল

ধাঁধা

ছোট্কার সেই রহস্যগল্প-লেখক বন্ধুটি আবার কটা বই পাঠিয়েছে ছোট্কার কাছে।

এ-ক'দিন ছোট্কার হাতে সেই বই ক'টাই ঘুরতে-ফিরতে চোখে পড়ছে। বইগুলোর মলাট এবং নাম দুইই বেশ জব্বর। আমিও হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখেছি কয়েকটা, পড়ার সুযোগ পাইনি।

এবারের ধাঁধার জন্য ছোট্কার কাছে যেতেই ছোট্কা বলল, "আমার মাথায় এখন খালি গোয়েন্দা গল্প ঘুরছে সতুবাবু। ধাঁধা-টাঁধা আসছে না।"

আমি উত্তর দিইনি। কীই বা বলব। ছোট্কা বোধহয় বুঝল আমার মনের অবস্থা। তারপর হেসে বলল, "সত্যি সতুবাবু, গল্পের গোয়েন্দারা কেউই নিছক মানুষ নয়, সবাই অতিমানব। কীভাবে যে ঠিক বেঁচে যায়, কী বলব।"

আমি এ-কথারও কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ধাঁধা পাব না, এটাই আমার কাছে বড় দুঃখ। তখনও চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎই ছোট্কা বলল, "না, আমারই ভুল হয়েছে। সতুবাবু দেখছি নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। ধাঁধা ছাড়া কথাই বোধহয় বলবে না আজ। ঠিক হ্যায়, লেখো ধাঁধা। আমি মুখে বলে যাচ্ছি।"

এতক্ষণে আমি যেন প্রাণ পেলাম। খাতা-পেনসিল তো সঙ্গেই ছিল. লিখে নিতে কতক্ষণ।

প্রথম ধাঁধা ॥ এক লেখকের চারটি রহস্য-উপন্যাস। উপন্যাস-গুলোর নাম—'মোমের মায়া', 'ডাকবাংলোর রহস্য' 'ঊনপঞ্চাশী বায়ু' এবং 'সন্ধানী গোয়েন্দা'। চারটি উপন্যাসের পাঁচটি গোয়েন্দা-চরিত্র দারুণ ইন্টারেস্টিং। চরিত্র-গুলো হল, কাঁপল, কমল, ললিত, মৃগেন আর মৃদুল। এদের মধ্যে মৃগেন ও মৃদুল হল যমজ ভাই।

এবারে নীচে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল। তথ্যগুলো থেকে বার করতে হবে, কোন্ উপন্যাসে রয়েছে কোন্ চরিত্র।

(ক) 'মোমের মায়া' ও 'সন্ধানী গোয়েন্দা'-র মধ্যে দুই চরিত্রের নামের প্রথম অক্ষর হল 'ক'।

(খ) 'ডাকবাংলোর রহস্য' বইতে যমজ ভাইদের কোনো প্রসঙ্গ নেই।

(গ) 'মোমের মায়া' বইতে কোনো চরিত্রের নামই কাঁপল নয়।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুই ভাই। একজন বিক্রি করে ষাট পয়সা জোড়া কলা, অন্য জন ষাট পয়সায় তিনটে কলা। দুজনেরই ষাটটা করে কলা ফুড়িতে থাকে রোজ।

একদিন একভাই অসুস্থ। অন্য ভাইটি ১২০টি কলা নিয়ে গেল বাজারে। সেদিন সে দুজনের হিসেব এক করে এক টাকা কুড়ি পয়সায় পাঁচটা করে কলা বিক্রি করবে ঠিক করল।

বলতে পারো, সেদিন তার মোট টাকা যা হবে, তা অন্য দিনের দু-ভাইয়ের মোট বিক্রির টাকার থেকে কম না বেশি? নাকি একই থাকবে মোট টাকা? কম-বেশি যদি হয়, কেনই বা হবে?

গতবারের উত্তর ॥ (১) তিন কাপ পাত্রটায় জল ভরে প্রথমে পাঁচ কাপে ঢালো, ফের তিন কাপ পাত্রটা ভর্তি করে পাঁচ কাপে ঢালো। দু-কাপ ঢালতে পারবে, তিন কাপের পাত্রে থেকে যাবে এক-কাপ জল। এবার পাঁচ কাপ পাত্রের পুরো জলটা ঢেলে ফেলে দাও বাইরে। তিন-কাপ পাত্রের এক কাপ জল ঢেলে দাও পাঁচ-কাপ পাত্রে। তিন-কাপ পাত্রটায় আবার জল ভরো, এই তিন-কাপ জল পাঁচ-কাপ পাত্রের এক-কাপ জলের উপর ঢাললেই চার-কাপ জল পেলে। (২) নটাই রইল। (৩) ১০$\frac{২}{৩}$ মাইল, ঘণ্টায় গড় গতিবেগ। (৪) ৭× ৭$\frac{৭}{৭}$ অথবা ৭{৭+(৭÷৭)}।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

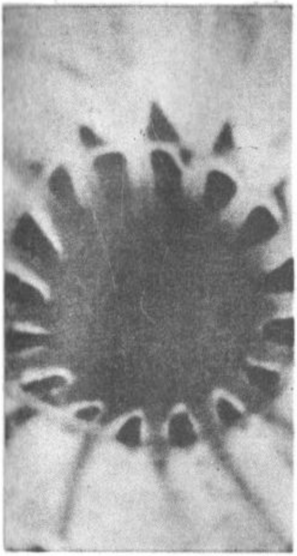

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল হার-মোনিয়াম রীডের ফোটো

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ চিকেন-রোল কেমন করে তৈরি করে বলতে পারেন?

উঃ একটা চিকেনকে কেটে ভাল করে সেদ্ধ করে নুনঝাল মাখিয়ে গোল গোল করে কাটো। তারপর পরিমাণমতো সস্ মাখিয়ে উঁচু কোনো জায়গা থেকে নীচে গড়িয়ে দাও।

প্রঃ কর্মধারয় সমাসের একটা ভাল উদাহরণ দিতে পারেন?

উঃ লোকটির একমাত্র কর্ম লোকের কাছে ধার করা।

প্রঃ মহাভারতে কর্ণকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছিল?

উঃ কর্ণাটকে।

সুসেন

মজার খেলা

ঠিকমতো দেখাতে পারলে খেলাটা মনে হবে আসল কোনো ম্যাজিক। আসলে এটা ম্যাজিকই, খেলাচ্ছলে দেখানো।

পুরো-হাতা জামা পরে এ-খেলাটা দেখানো যায়। আর যদি কোট-প্যান্ট-পরা জাদুকর সেজে দেখাও, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই।

খেলাটার কৌশল বলছি পরে, আগে খেলাটা শুনে নাও। টেবিলের ওপর থেকে একটা দেশলাই-বাক্স হাতে তুলে নিয়ে তুমি কয়েকবার ঝাঁকালে, ভেতরের কাঠিগুলোর নড়াচড়ার শব্দ শোনালে বন্ধুদের। এবার তাদের বলো, এই শব্দ শুনে কি কেউ আন্দাজ করতে পারবে

ভেতরে কটা কাঠি রয়েছে? যার যেমন মনে হবে, সে তেমন বলুক। দেখা যাক, কার আন্দাজ ঠিক হয় কিংবা কাছাকাছি যায়।

বন্ধুরা এক-একজন এক-একটা সংখ্যা বলবে। বলুক। তুমি শুধু শুনে যাও। সব-শেষে হাতের দেশলাই-বাক্সটা খুব আস্তে আস্তে খুলে দেখাও। সবাই অবাক হয়ে দেখবে, এ কী কাণ্ড, একদম ফাঁকা দেশলাই-বাক্সটা, কোথাও কোনো কাঠি নেই!

হ্যাঁ, তাই দেখাতে পারবে। কেননা, টেবিলের ওপর রাখা দেশলাই-বাক্সটা সত্যিই আগে থেকে ফাঁকা করে রাখবে তুমি, আর অল্প-কিছু কাঠিভরা আরেকটা দেশলাই-বাক্সকে জামার আস্তিনের তলায় রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রাখবে। খালি দেশলাই-বাক্সটা হাতে নিয়ে হাত ঝাঁকালে জামার আস্তিনের তলায় লুকোনো দেশলাই-বাক্সের আওয়াজ হবে। আর সেইখানেই খেলাটার মজা।

মজারু

হাসিখুশি

ডাক্তারবাবু : বসন্তের টিকা নিয়েছেন? চতুর্দিকে যা বসন্ত হচ্ছে!

রোগী : না,নিইনি এখনো।

ডাক্তারবাবু : কেন?

রোগী : এখন তো শীতকাল!

ছাত্র : আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন স্যার।

শিক্ষক : একদম না, একদম না। আমি তো দূরের কথা, স্বয়ং ভগবানও ওদের বিশ্বাস করেন না। যা বিচ্ছু ওরা।

শিক্ষক : আজ কীরকম পরীক্ষা দিয়েছ?

বকুল : কালকের মতো স্যার।

শিক্ষক : কাল কীরকম হয়েছিল?

বকুল : ঠিক আজকের মতো।

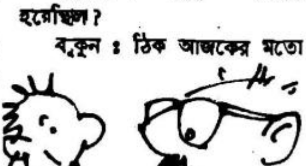

শিক্ষক : বকুল, 'কম্পাস' কী জানো?

বকুল : জানি স্যার, বেশি ফেল।

ছবি অহিভূষণ মালিক

IOB/3/80 Ben

মীনার বাবা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। ওর নামে আই ও বি-তে মাইনর্স অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন। আর তাতে ওর ছুটকো ছাটকা বাড়তি যত পয়সা ছিল সব ভরে দিয়েছিলেন। মীনার বয়েস এখন ১২ বছরের ওপর— তাই ওর অ্যাকাউন্টের লেনদেন ও নিজেই করে, আর সঞ্চয়ের ওপর সুদ পায়।

আই ও বি-র মাইনর্স অ্যাকাউন্ট

আজকের সঞ্চয় আপনাকে নিয়ে যায় বহুদূর!

আই ও বি-তে আসুন! আপনার জন্যে আমাদের বহু প্রকল্প তৈরী আছে।

ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক
আপনার প্রগতির পথে সত্যিকার সাথী

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলেকে চুরি করেছেন চন্দ্রভান্। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিসের-হাতে-আটক কেহ্‌ন একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চন্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়; পরে সেখানকার ধনী বাসিন্দা সূর্যনারায়ণের কাছে। তার নাম এখন দেবদত্ত, ওরফে দেবু। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু; কিন্তু দেবু যে জয়রামের ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভান্ চুরি করেছেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হবে। দেবুও ওদিকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে, তারাও এখন কলকাতায়। অনুতপ্ত চন্দ্রভান্ ইতিমধ্যে নকল-জ্যোতিকে জয়রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। আসলে তিনি জয়রামেরই ছোট ভাই। জয়রাম তো নকল-জ্যোতিকেই জ্যোতি বলে জানেন; কিন্তু সূর্যনারায়ণ বলছেন, এই তো তাঁর দেবু। তারপর—

॥ ২৫ ॥

দেবু চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এখানে এত লোক। এরই নাম কলকাতা!

সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করলে, "এটা কী নদী সাধুবাবা?"

"এটা গঙ্গা, হিমালয় থেকে সমস্ত দেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছে। চান্দোলিতে তো তুই গঙ্গা দেখেছিস, এখানেও সেই একই গঙ্গা।"

"এ কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছে।"

সাধুবাবা বললেন, "এ এখান দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মানুষ যেমন একদিন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে গিয়ে মেশে, নদীও তেমনি। নদী সমুদ্রে গিয়ে কিন্তু শেষ হয় না সম্পূর্ণ হয়, মানুষের জীবনও তেমনি মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয় না, সম্পূর্ণ হয়।"

দেবু বললে, "মানুষ কেন মরে সাধু-বাবা?"

সাধুবাবা বললেন, "আমি তো অনেক লোককে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কি বাঁচে? একদিন মানুষের জন্যেই মানুষের মরা দরকার। না মরলে রামজির সৃষ্টি যে থেমে যাবে। এই দেখ না, এই যে গঙ্গার জল বয়ে চলেছে, এই জল যখন হিমালয়ের ঝর্না থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে তার যাত্রা সম্পূর্ণ করবে, তখন সমুদ্র থেকে আবার বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে মেঘ হয়ে যাবে। তখন আবার সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নামবে, তারপর সেই জল আবার নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। অনাদি কাল এই-ই চলে আসছে।"

দেবু জিজ্ঞেস করলে, "একদিন তাহলে তুমিও মারা যাবে?"

সাধুবাবা বললেন, "নিশ্চয়ই। আমিও মরব, তুইও মরবি। জন্মালেই মরতে হবে। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি নেই। মানুষের যদি মৃত্যু না হয় তাহলে যে সৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু মৃত্যু হলেই যে তার শেষ হবে তা নয়। কারণ মানুষ অমর। মরে গিয়েও আবার সে জন্মাবে। জন্ম-মৃত্যুর এই পালা বরাবর চলেছে, বরাবর চলবে।"

পাশ দিয়ে শব্দ করতে করতে একটা বাস চলে গেল।

দেবু জিজ্ঞেস করলে, "কলকাতায় এত লোক কেন সাধুবাবা?"

সাধুবাবা বললেন, "লোক হবে না? পাপ করতে হলেও সবাইকে কলকাতায় আসতে হয়, পুণ্য করতে হলেও এই কলকাতাতে আসতে হয়। বাঁচতে গেলেও এখানে আসতে হয়, মরতে গেলেও এখানে আসতে হয়। তিন-শো বছর আগে একদিন ইংরেজরা বাঁচবার জন্যে এখানে এসেছিল, আবার একদিন আমাদের হাতে মার খেয়ে তারা চলে গেল। এখনও তাই সারা ভারতবর্ষ থেকে লোকরা দলের পর দল এখানে আসছে। যারা মার খাচ্ছে তারা চলে যাচ্ছে, কিন্তু আবার বাঁচবার তাগিদে অন্য দেশ থেকে সবাই বাঁচবার জন্যে আসছে। জন্মমৃত্যুর মতো আসা-যাওয়ার এই খেলা সেই তিনশো বছর আগে থেকেই চলে আসছে।"

"কত দিন এই রকম আসা-যাওয়া চলবে?"

"যতদিন কলকাতা থাকবে, ততদিন।"

"কতদিন কলকাতা থাকবে?"

"চিরকাল। আসা-যাওয়া নিয়েই তো জগৎ। জগৎ থাকলে কলকাতা থাকবে। দেখ

না. একদিন পাঠান-মোগল এসেছিল, তারপর এসেছিল পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরেজ, তারপর বর্গিরা এসেছে কতবার। সবাই যাবার জন্যেই এসেছে, এখনও যারা আসছে তারাও একদিন চলে যাবে। তবু কলকাতা থাকবে। দেখছিস না, আমরা কোথায় কতদূরে ছিলাম, আবার কলকাতায় এলুম। অবার আমরাও একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে যাব।''

"এখানে যদি থাকবে না, তাহলে কেন এখানে এলুম আমরা?''

"আমরা কি এসেছি, রামজি যে আমাদের এখানে নিয়ে এল। এখানে আসার পেছনেও নিশ্চয় রামজির কোনও উদ্দেশ্য আছে।''

বলে সাধুবাবা একটা গান গাইতে লাগলেন। বললেন,, "এই গানটা শোন, তোদের ভক্ত কবি রামপ্রসাদ এই গানটা লিখে গেছেন—

মা গো, আমার এই ভাবনা
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
কোথায় যাব নাই ঠিকানা
আমার দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু
তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা
আমি মনকে বলি ভজ কালী
তারা কেউ কথা শোনে না।''

সাধুবাবা গুনগুন করে গাইতে-গাইতে একমনে চলতে লাগলেন। দেবুও চলতে লাগল সঙ্গে-সঙ্গে, মানুষের ভিড় কাটিয়ে।

জয়রামবাবুর বাড়িতে তখন মহা হৈ-চৈ পড়ে গেছে জ্যোতিকে নিয়ে। চন্দ্রভানুবাবু বলেন, "এই-ই হচ্ছে আসল জ্যোতি! আমি একেই একদিন এই বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলুম, আর আমি জানব না?''

সূর্যনারায়ণবাবু বলেন, "না, এ জ্যোতি নয়, এ দেবু। আমার দেবুও তো একদিন বাড়ি থেকে আমার ওপর রাগ করে চলে গিয়েছিল।''

জয়রামবাবু বলেন, "না, এ তোমার দেবু কিছুতেই হতে পারে না, এ আমার জ্যোতি তুমি কি বলতে চাও আমার জ্যোতিকে চিনতে পারি না?''

চান্দৌলি থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে দেবরাজ চৌবেও এসে হাজির। সেও এক নজরে দেখে বললে, "এ তো আমাদের দেবু বড়বাবু। কী রে দেবু, আমাকে তুই চিনতে পারছিস না?''

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি? আমি এতদিন ওকে আমার বাড়িতে খাইয়েছি, দাইয়েছি, মানুষ করেছি। কী রে, তুই মনে করতে পারছিস না? সেই যে তুই কোথা থেকে সাধুবাবাকে আমার কাছে এনেছিলি, তাকে আমি পঞ্চাশ টাকা দিলুম কম্বল কেনবার জন্যে? মনে নেই তোর? তারপর আমি আবার দরোয়ান দিয়ে সেই পঞ্চাশ টাকা কেড়ে নিয়েছিলুম বলে তোর খুব রাগ হল, তুই ঝগড়া করলি আমার সঙ্গে? কিছুই মনে পড়ছে না তোর?''

জ্যোতির তখন পায়ের হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সূর্যনারায়ণবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বললে, "আমার কিছু মনে পড়ছে না।''

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "তা একটু কষ্ট করে মনে করবার চেষ্টা কর না। তোর পা আমি ভাল করে দেব। যত টাকা লাগে পা ভাল করতে, সব আমি খরচ করব।''

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "টাকা খরচ করতে তো আমিও তৈরি। আর এর জন্যে টাকা কি আমি কম খরচ করেছি বলতে চান? এর পা ভাল করবার জন্যে বোম্বাইতে যত হাসপাতাল আছে, সবগুলোতে দেখিয়েছি। ডাক্তারদের গাদা-গাদা টাকা দিয়েছি। সবাই বলেছে পাটা অকেজো হয়ে গেছে। সবাই বলেছে, ও পাটা না কেটে ফেললে দিন-দিন ওটা আরো বেড়ে যাবে।''

জয়রামবাবুর চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছিল। এতদিন পরে যদিই বা জ্যোতিকে ফিরে পেলেন তাও আবার তার এই অবস্থা।

চন্দ্রভানুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুই আমার নিজের পেটের ভাই হয়ে আমার এই সর্বনাশ করলি রে? আমি তো তোর কোনও ক্ষতি করিনি কখনও?''

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "কিন্তু আমার দোষটাই কেবল তুমি দেখলে দাদা! তোমরা সবাই মিলে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ, সেটা একবার ভেবে দেখো। তোমরা সবাই মিলে বলতে, আমার কিচ্ছু হবে না। সবাই বলতে আমি একটা অপদার্থ জীব। তাই আমি

তোমাদের কথা দিন-রাত শুনে শুনে বাড়ি ছেড়ে পালালুম। ভাবলুম জীবনে যদি কোনও দিন বড় হতে পারি তো তখন আমি তোমাদের দেখাব। তুমি বাবার টাকা-কড়ি পেয়ে বড়লোক হয়েছ, আর আমি? নিজে মেহনত করে টাকা উপায় করেছি, বড়লোক হয়েছি। আমার বাড়ি গাড়ি লরি টেম্পো কারবার হয়েছে। আমি মোতিহারিতে এত বড় বাড়ি করেছি যে, সে বাড়ি দেখে তুমি চমকে যাবে। কিন্তু একদিন ভাবলুম কার জন্যে এসব করলুম? ভাবলুম আমি মারা যাবার পর কে এসব সম্পত্তি ভোগ করবে? তখন একদিন একটা কাজে কলকাতায় এলুম। এখানে এসে দেখলুম তোমার একটা ছেলে। সেই ছেলেটি দেখলুম বাইরের ঘরে বসে মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। আমার খুব হিংসে হল তোমাকে দেখে। দেখলুম তুমি বাবার টাকা পেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বেশ আরাম করে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছ। আর তোমার একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলেও আছে। কিন্তু আমার? আমার যথেষ্ট টাকা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু সংসার নেই, একটা ছেলেও নেই। তখন একদিন তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমার ছেলেকে পার্ক থেকে চুরি করে নিয়ে গেলুম। সেসব তো তোমাকে আগেই বলেছি—"

জয়রাম বললেন, "কিন্তু সেই জ্যোতিকে যদি ফিরিয়েই দিলি তো এমনি করে ফিরিয়ে দিতে হয়? এই অসুস্থ জ্যোতিকে নিয়ে এখন আমি কী করি? কী করে এর পা সারিয়ে তুলি?"

সূর্যনারায়ণবাবু এতক্ষণ সব শুনছিলেন। বললেন, "আমি দেবুকে সারিয়ে তুলব জয়রাম, আমাদের ওখানে বারাণসীতে খুব বড় হাসপাতাল আছে, খুব বড়-বড় ডাক্তার আছে। আমি দেবুকে সেখানে নিয়ে যাই—"

চন্দ্রভানুবাবু আর থাকতে পারলেন না। বললেন, "আপনি বার বার ওকে দেবু বলছেন কেন? ওর নাম কি দেবু, ও তো জ্যোতি।"

পাশে দেবরাজ চৌবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, "ওর নাম দেবুই তো। আমি দেবুকে

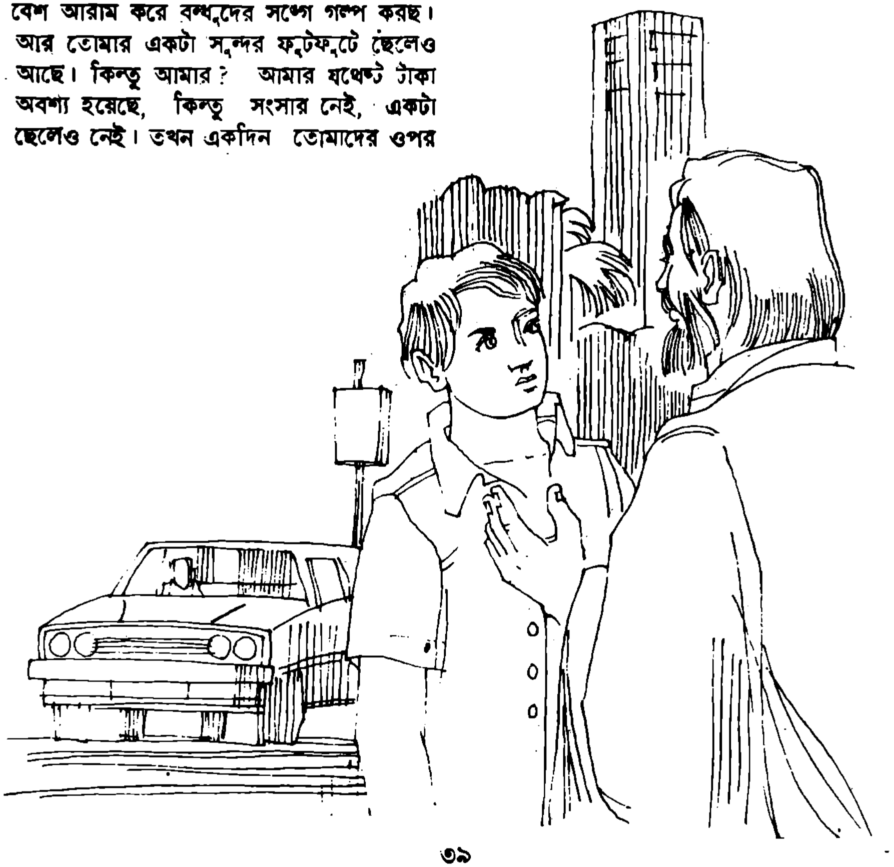

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ– যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া।
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

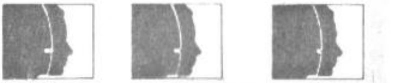

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমূলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

কি ক'রে দেখুনঃ

* প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
* ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
* ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য,
জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 BN

চিনি না? ও আমার দোকানে কতদিন কাজ করেছে, শেষকালে বড়বাবু আমার কাছ থেকে ওকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে তুললেন। আমি ওকে চিনব না?''

জয়রামবাবু বললেন, ''আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে বিনয় মাস্টারকে ডাকো। বিনয় মাস্টার ওকে ছোটবেলা থেকে রোজ পড়িয়েছে, সে এসে বলুক ও জ্যোতি কিনা।''

তা তাই-ই হল। বিনয় মাস্টারকে ডাকতে লোক গেল। খবর পেয়েই তিনি দৌড়ে এলেন।

জয়রামবাবু বললেন, ''আচ্ছা মাস্টার, তুমি তো বহুদিন ধরে জ্যোতিকে পড়িয়েছ। তুমিই বলো তো এ জ্যোতি কি না।''

বিনয় একবার দেখেই বলে উঠলেন, ''এ তো জ্যোতি। এ তো হারিয়ে গিয়েছিল, একে কোথা থেকে খুঁজে পেলেন?"

জয়রামবাবু চন্দ্রভানুবাবুকে দেখিয়ে বললেন, ''এই আমার ভাই চন্দ্রভানু, এই ভাই-ই আমার এই সর্বনাশ করেছিল। এখন পা ভেঙে গিয়েছে, তাই উপায় না দেখে আমার কাছে নিয়ে এসেছে।''

বাড়ির যত চাকর-বাকর কৈলাস ভৈরব গোপাল সবাইকেই জিজ্ঞেস করা হল একে একে।

''এই কৈলাস, তুই বল না, এই তো আমাদের জ্যোতি?''

কৈলাস বললে, ''হ্যাঁ বড়বাবু, এই-ই তো আমাদের খোকাবাবু।''

"আর ভৈরব, তুই কী বলিস?"

ভৈরব বললে, ''আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, এই-ই আমাদের খোকাবাবু। একে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, আর একে আমরা চিনব না?''

গোপালও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। জয়রাম-বাবু তাকেও জিজ্ঞেস করলেন, ''কী রে গোপাল, তুই কিছু বলছিস না যে? তুই-ই তো রোজ জ্যোতিকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যেতিস, তোর গাফিলতির জন্যেই তো জ্যোতি হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তুই-ই বল এ খোকাবাবু কি না।''

গোপালও সেই একই কথা বললে, ''হ্যাঁ হুজুর, এই-ই আমাদের সেই খোকাবাবু।''

খবর পেয়ে একে-একে আরো অনেকে এসে গেল। মুখুজ্যে-মশাই এলেন, সরকারমশাই এলেন, গাঙ্গুলিবাবুও এসে গেলেন। তাঁরা আগে রোজ জয়রামবাবুর কাছে গল্প করতে আসতেন।

জয়রামবাবু তাঁদেরও জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো সবাই জ্যোতিকে আগে দেখেছেন, আপনারাই বলুন এ জ্যোতি কি না।"

সবাই একবাক্যে বললেন, ''আজ্ঞে, এই-ই তো আপনার জ্যোতি।''

হঠাৎ বিনয় বললেন, "আপনি তো এই জ্যোতির একটা ফোটো তুলেছিলেন, সেই-খানা বার করুন না, সেইটে বার করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"

তখন জয়রামবাবুর মনে পড়ল। সে অনেক কাল আগেকার কথা। একবার কী তাঁর শখ হয়েছিল, ফোটোগ্রাফারকে ডাকিয়ে তিনি নিজের আর জ্যোতির একটা ফোটো তুলিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সেখানা কোথায় রেখেছিলেন তা মনে ছিল না। তিনি নিজের আলমারিটা খুঁজলেন, সেখানে নেই। লোহার সিন্দুকটা খুঁজলেন, সেখানেও নেই। আর কোথায় থাকতে পারে? একটা তাকের ওপর অনেক-গুলো বই সাজানো ছিল। অনেক দিন সেগুলোতে হাত পড়েনি, ধুলো জমেছিল তাতে। সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই তার ভেতর থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বেরিয়ে এল।

জয়রামবাবু বললেন, "এইবার পেয়েছি।" বলে ধুলো ঝেড়ে সকলকে দেখালেন সেটা। তখন জ্যোতির বয়েস এক বছর। জয়রামবাবুর কোলে বসে আছে জ্যোতি।

জয়রামবাবু বললেন, ''এই দেখ, এর যখন একবছর বয়েস, তখন জ্যোতির আর আমার এই ছবি তুলিয়েছিলাম, এখন তোমরা সবাই মিলিয়ে নাও, এ জ্যোতি কিনা।''

সূর্যনারায়ণবাবুও দেখলেন, দেবরাজ চৌবেও দেখলে। দেবরাজ বললে, ''এ কী করে মেলে? এক বছরের ছেলের ছবির সঙ্গে কি বারো-তেরো বছরের বয়েসের ছেলের মেলে?''

কিন্তু বিনয় বললেন, ''কিছুটা মিল থাকেই। এই দেখুন না, ঠিক এই রকম চোখ এই রকম নাক, এই রকম চুল। বয়েসই মানুষের বাড়ে, কিন্তু চোখ মুখ নাক চুল তো বদলায় না।''

সবাই বিনয়কেই সমর্থন করলেন।

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, ''ও কে, তাই নিয়েই আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু ওর

চিকিৎসার কথা তো কেউ ভাবছেন না।"

জয়রামবাবু বললেন, "ডাক্তার সেনকে একবার দেখালে হয় না? ডাক্তার অমরজিৎ সেন, তিনি তো শুনেছি খুব নামজাদা সার্জেন।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তাঁকে কি আমি দেখাইনি ভাবছেন? কলকাতারও কোনও ডাক্তারকে দেখাতে বাকি রাখিনি। ডাক্তার সেনকে দেখিয়েছি, ডাক্তার সরকারকে দেখিয়েছি। ডাক্তার চৌধুরী, ডাক্তার চক্রবর্তীকে দেখিয়েছি, কেউ কিছু করতে পারেননি। অন্তত বারোবার এক্সরে করা হয়েছে। যে যা বলেছে তাই-ই করেছি। যখন কিছুতেই কিছু হয়নি তখন আর কোনও উপায় না দেখে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন যা ভাল বোঝো, তাই করো তুমি, আমি আর কিছু ভাবতে পারিনি। এখন তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে দাও, আমি সব শাস্তি মাথা পেতে নিতে তৈরি।"

বিনয় বললেন, "মাদ্রাজে শুনেছি একজন ভাল সার্জেন আছেন। তাঁর খুব নাম শুনেছি।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমি তাঁর কাছে নিয়েও দেখিয়ে এসেছি।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "দেবুর জন্যে যা-কিছু করতে হয় সব আমি করতে তৈরি। আমার কেউ নেই, ওই-ই আমার একমাত্র সন্তান। আমি ওকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করেছি—"

জয়রামবাবু বললেন, "দেবু বলছ কেন? ও তো জ্যোতি। ও তো আমার ছেলে।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "যারই ছেলে হোক, ওর নাম দেবুই হোক আর জ্যোতিই হোক, আগে ওকে বাঁচানো দরকার, যদি আপনার জানা কোনও ভাল ডাক্তার থাকেন কলকাতায়, তাঁকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন আপনারা।"

বিনয় বললেন, "আমার একজন জানা সার্জেন আছেন মেডিকেল কলেজে।"

"কী নাম তাঁর?"

"ডাঃ সর্বেশ্বর চক্রবর্তী।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "না, তাঁকে দেখাইনি, যদি ভাল মনে করেন তো তাঁকেই দেখান।"

বিনয় বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে আজই তাঁকে দেখাবার ব্যবস্থা করছি।"

কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে একেবারে আদিগঙ্গার ওপর সোনার কার্তিকের ঘাট। এককালে ওখানে সোনার কার্তিকের পুজো হত, তাই ঘাটটা সেই নামেই পরিচিত হয়ে আছে। সেখানে আজকাল খুব মানুষের ভিড় হতে শুরু করেছে। এক দাড়িগোঁফওয়ালা সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন। সেখানে সকাল বেলা থেকেই মানুষের জটলা জমে যায়। সাধুবাবা কারোর কাছ থেকে কিছু পয়সা-কড়ি নেন না। সঙ্গে একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে আছে। সে সেই সাধুবাবার চ্যালা।

ভিড় দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, "এখানে কী হয়েছে মশাই?"

উত্তর আসে, "একজন সাধুবাবা এসে উঠেছেন ওই বটগাছটার তলায়।"

"তা এত ভিড় কেন?"

"সকলের রোগ ভাল করে দেন সাধুবাবা।"

"কত পয়সা নেন?"

"পয়সা-টয়সা কিছু নেন না। হাসপাতালে গিয়ে যাদের রোগ সারে না, তাদের অসুখও সারিয়ে দেন সাধুবাবা। অনেক অন্ধ চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। অনেক পেটের রুগি ওঁর ওষুধ খেয়ে, এখন পাথর হজম করছে। বাত সারিয়ে দিচ্ছেন।"

পাশেই খেয়াঘাট। খেয়াঘাটে নৌকো পেরিয়ে ওপার থেকে যারা এপারে কালীঘাটে আসে, তারাও সাধুবাবাকে দেখতে আসে। সাধুবাবা যে ধন্বন্তরি তা রাতারাতি চার দিকের এলাকায় রটে গেছে।

দেবু সাধুবাবার পাশে বসে সব দেখে। এতকাল সাধুবাবার সঙ্গে কত জায়গায় সে ঘুরল। সব জায়গাতেই এই রকম। ফুলডাঙাতেও এই রকম হত। কুসুমগঞ্জেও এই রকম, চন্দননগরেও এই রকম। এখন আবার কালীঘাটের সোনার কার্তিকের ঘাটেও এই রকম হচ্ছে। এখান থেকে সাধুবাবা একদিন আবার তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন কে জানে।

একদিন অনেক রাত্রে একটু নিরিবিলি দেখে দেবু সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করলে, "সাধুবাবা!" (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

ট্যাকসো

রঞ্জন ভাদুড়ী

এই এই, শোন তো,
ঝটপট গোন তো
এক থেকে একশো
না পারলে ট্যাকসো
দিতে হবে কিন্তু,
জেনে রাখ বিন্তু !
ট্যাকসোটা জব্বর
শুনে রাখ বর্বর,
খেতে হবে গাঁট্টা
সাত-কম আটটা
বল দেখি কত হয় ?
তোর এ কম্মো নয় ?
অঙ্কে টঙ্ক নোস ?
কর তবে ওঠবোস
ঊনপঞ্চাশ বার—
আমার গোনার ভার !

টুটুলের জিজ্ঞাসা

দেবাশিস বসু

লেখাপড়া যে করে সে
খেলাধুলো করে না ?
খেলাধুলো যে করে সে
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে না !
এমন যে বলে তার
জবাব গাভাসকার।
মধুমিতা গোস্বামী,
দিব্যেন বড়ুয়া—
জিজ্ঞাসা করি আমি
শুধুই কি পড়ুয়া ?
খেলা যদি এলেবেলে
তাহলে কীভাবে পেলে
পেলেন রাজার মান
ফুটবল খেলা খেলে ?
যেখানেই যান আলি
লাখো হাতে বাজে তালি
এসব কি মিছিমিছি,
সবই শুধু খালি-খালি ?

ছবি দেবাশিস দেব

গোলাপি ব্যালেরিনা

দিদিমণি

ফ্লেমিংগো পাখির নাম তোমরা হয়তো শুনেছ। ইংরেজি 'ফ্লেম' শব্দটির অর্থ— আগুনের শিখা। আগুনের শিখার রঙ বলেই বোধহয় এই পাখির নাম রাখা হয়েছে ফ্লেমিংগো।

এদের ঘাড় সরু আর খুব লম্বা। ঠোঁটের ওপর দিক সাদা, নীচের দিক বেঁকে গেছে। সেখানের রঙ কালো, ডানার নীচের দিকের রঙও কালো। পাগুলো লম্বা-লম্বা লাঠির মতো। লম্বায় এই পাখি প্রায় ছ' ফুট।

যারা ব্যালে নাচে তাদের সাজ-পোশাকের সঙ্গে এদের চেহারার মিল আছে। তাই এই পাখিকে গোলাপি রঙের ব্যালেরিনা বলা যেতে পারে। এই পাখিরা মানুষকে, এমনকী অন্য পাখিদেরও এড়িয়ে চলে। এরা থাকে গরম দেশের লোনা জলা জায়গায় যেখানে অন্য পাখিদের সংখ্যা খুব কম। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গা, বিশেষত দ্বীপে এদের দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের গায়েও দেখা যায়। জলা জায়গার কাদার মধ্যে যে-সব ছোট পোকা-মাকড় থাকে সেইগুলোই এদের প্রধান খাবার।

এই পাখিদের স্বভাব একেবারে লাজুক ধরনের, মানুষকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই এরা বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, সেইজন্যে এদের ছবি তোলাও মুশকিল। এরা দল বেঁধে এক জায়গায় থাকে আর কাদা-মাটি দিয়ে বাসা তৈরি করে। এরা সাধারণত এমন দুর্গম জায়গায় থাকে যেখানে মানুষ বা অন্য কোনো পশু-পাখি যেতে পারে না। দরকার পড়লে এরা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। এরা ঠোঁট দিয়ে পালক ঘষে ঘষে গা পরিষ্কার করে স্নান করে। দুপুরে চড়া রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে লম্বা ঘাড় পালকের মধ্যে গুঁজে একপায়ে জলে দাঁড়িয়ে থেকে খানিকটা ঘুমিয়েও নেয়।

এদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এদের বেশি দেখা যায়। আগে অন্যান্য দ্বীপে ও সমুদ্রের ধারেও এদের দেখা যেত। কিন্তু মানুষ যেমন খুশি শিকার করে করে এদের সংখ্যা ক্রমশই কমিয়ে দিচ্ছিল। যে-সব জায়গা দুর্গম সেখানেও এরোপ্লেন নিচুতে নামিয়ে মানুষ এদের ভয়

পাইয়ে দিচ্ছিল।

এখন আইন তৈরি করা হয়েছে—কেউ আর ফ্লেমিংগো মারতে পারবে না। ফ্লেমিংগোরা যেখানে থাকে তার থেকে অন্তত দু' হাজার ফুট উঁচু দিয়ে এরোপ্লেন চালাতে হবে। এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে পাখিদের সংখ্যা বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পাঁচ হাজার থেকে বেড়ে পনেরো হাজার হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই।

ফ্লেমিংগোরা তাদের বাসার কাদার ওপর ডিম পাড়ে। সাধারণত চার সপ্তাহ ধরে ডিমে তা দেয়। ডিমের খোলা খুব শক্ত। ফ্লেমিংগোর বাচ্চারা ভাঙবার চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে খোলার ভেতরেই একটু বিশ্রাম করে নেয়। এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করে ডিমের খোলস ভাঙে বাচ্চারা। অনেক বাচ্চা মরেই যায়।

বাচ্চা ফ্লেমিংগো অনেকটা হাঁসের মতো দেখতে এবং আকারে অতটাই বড়। ফ্লেমিংগো মা তার ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে দেয়। দশ দিন বয়েস হলে বাচ্চা ফ্লেমিংগো অনেকটা বড়দের মতো দেখতে হয়. পা ও ঠোঁট লম্বা হয়ে যায়।

বাচ্চাদের দেখতে বিশ্রী। তাদের পালক হালকা ধুলোটে রঙের হয়। পাঁচ সপ্তাহ বয়েস হলে গায়ে পালক গজাতে থাকে। মা তখন বাচ্চাকে ছেড়ে চলে যায়। বাচ্চাকে তখন

থেকেই নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হয়।

সমুদ্রে ঘেরা যে-সব দ্বীপে এই পাখিরা থাকে, সেখানে তো ঝড় লেগেই আছে। হ্যারিকেন নামে একরকম ভয়ানক ঝড়ে মানুষের ঘর-বাড়ির যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি ক্ষতি হয় এই পাখিদের। অনেক পাখি মারা যায়।

স্পেন দেশের গুহার গায়ে ফ্লেমিংগো পাখির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, যীশু জন্মাবার পাঁচ হাজার বছর আগে এই ছবিগুলো আঁকা হয়েছিল।

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় অনেক ফ্লেমিংগো শিকার করা হয়েছিল। একশো বছর আগেও ফ্লোরিডায় শিকার করে মারা ফ্লেমিংগো পাখি বাজারে বিক্রি করা হত। তাহলে বুঝতেই পারছ, কত ফ্লেমিংগো মানুষের হাতে মারা গেছে। সম্প্রতি গোলাপি পালকওয়ালা সুন্দর ফ্লেমিংগো পাখিদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে. এটা খুবই আনন্দের কথা।

ছোটদের যত সেরা বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় চরিত্র আমদানী করেছেন কিশোরসাহিত্যে। সেই চরিত্রের নাম টেনিদা। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের প্রিয় এই টেনিদার যাবতীয় কাহিনী একসঙ্গে সকলের হাতের মুঠোয় যাতে পৌঁছে যায় তার জন্যই খন্ডে-খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র কিশোরসাহিত্য। শুধু টেনিদার আশ্চর্য মজাদার কাহিনীগুলিই নয়, সেই সঙ্গে থাকছে আরও অনেক দুর্ধর্ষ সব উপন্যাস-গল্প-ছড়া-কবিতা আর প্রবন্ধ। শুধু টেনিদার গল্পেই জিভে জল আসে, আর এই বইতে এত সব বাড়তি আকর্ষণ।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সব্যসাচী কথাসাহিতিক। এই সঙ্গে তিনি বড়োদের এবং ছোটদের লেখক। বড়োদের লেখাতেও যেমন অসীম খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি, তেমনই ছোটদের লেখাতেও তিনি সহজেই খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছেন। বিশেষ করে ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি তো তুলনাহীন। সারা বইতে ছড়ানো থাকে গা-ছমছম পরিস্থিতি এবং বুক-ছমছম উৎকণ্ঠা। সব সময় মনে হয়, কী হয়, কী হয়। আর একেকবারে শেষে গিয়ে যখন সব রহস্যের জট খুলে যায় দারুণ বুদ্ধি-গমগম সমাধানে, তখন কী মজাই না লাগে।

শৈলেন ঘোষের অরুণ বরুণ কিরণমালা ৭ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ **কবন্ধ** বিগ্রহের কাহিনী ১০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ শরদিন্দু অম্‌নিবাস ৪র্থ ২০ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৭ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজকাহিনী ৫ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫ মজার এক্সপেরিমেণ্ট ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৫ রসায়নের ভেল্‌কি ৪ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭ তপন চরিত ৬ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

আমাদের কোকিল

আমাদের বাড়ির বাগানে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, জামরুল ও কুলের গাছ আছে। জামরুল গাছ বাড়ির ভেতর। কাঁঠাল গাছ বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে। এই গাছগুলিতে সারা বছর ময়না, দোয়েল, টিয়া, মুনিয়া, টুনটুনি, বুলবুলি, শালিক, মাছরাঙা, হলদে-বাসন্তী, পাপিয়া, ঘুঘু, হাঁড়িচাঁচা, ছাতার, কোকিল প্রভৃতি পাখি এসে খেলা করে।

বসন্তকাল এলেই কোকিলরা কু কু করে ডাকে। তার মধ্যে একটা কোকিল প্রত্যেক বছর বসন্তকাল এলেই আম গাছ ও কাঁঠাল গাছে বেশি সময় থাকে। অন্য কোথাও যায় না। কু কু করে গান করে। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো ও চোখ দুটি টুকটুকে লাল।

আমাদের সে ভয় পায় না। আমরা গাছের কাছে গেলে সে একটা ডাল থেকে অন্য ডালে যায়। উড়ে যায় না। পাড়ার ছেলেরা তাকে কুহু কুহু করে ভেংচি কাটে। সেও কু কু করে সাড়া দেয়। গলা চিরে গেলেও তার ডাক থামে না। বড়রা তার ডাক শোনে ও তাকিয়ে দেখে। সে খাঁচায় নেই তবু আমাদের পোষা কোকিল পাখি হয়ে গেছে।

কল্পন ঘোষ (বয়স ৬)

চিড়িয়াখানার বাঘ

চিড়িয়াখানার বাঘ,
বাপ রে কী তার রাগ।
খাঁচার ভিতর থাকে,
হালুম বলে ডাকে।
চোখদুটো তার বড়,
ভয়েই জড়োসড়ো।
গায়ে ডোরা-কাটা জামা,
যেন ভোম্বল-মামা।
চিড়িয়াখানার থেকে
আসছি সবে দেখে ॥

সুলগ্ন বিশ্বাস (বয়স ৭)

ছোট মেয়ে

ছোট মেয়ে মুনমুন
গান গায় গুনগুন
জলসায় ডাক পেলে
চলে যায় রেঙ্গুন

গীতিকা দাশ (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে **পারমিতা ভট্টাচার্য** (বয়স ৯)

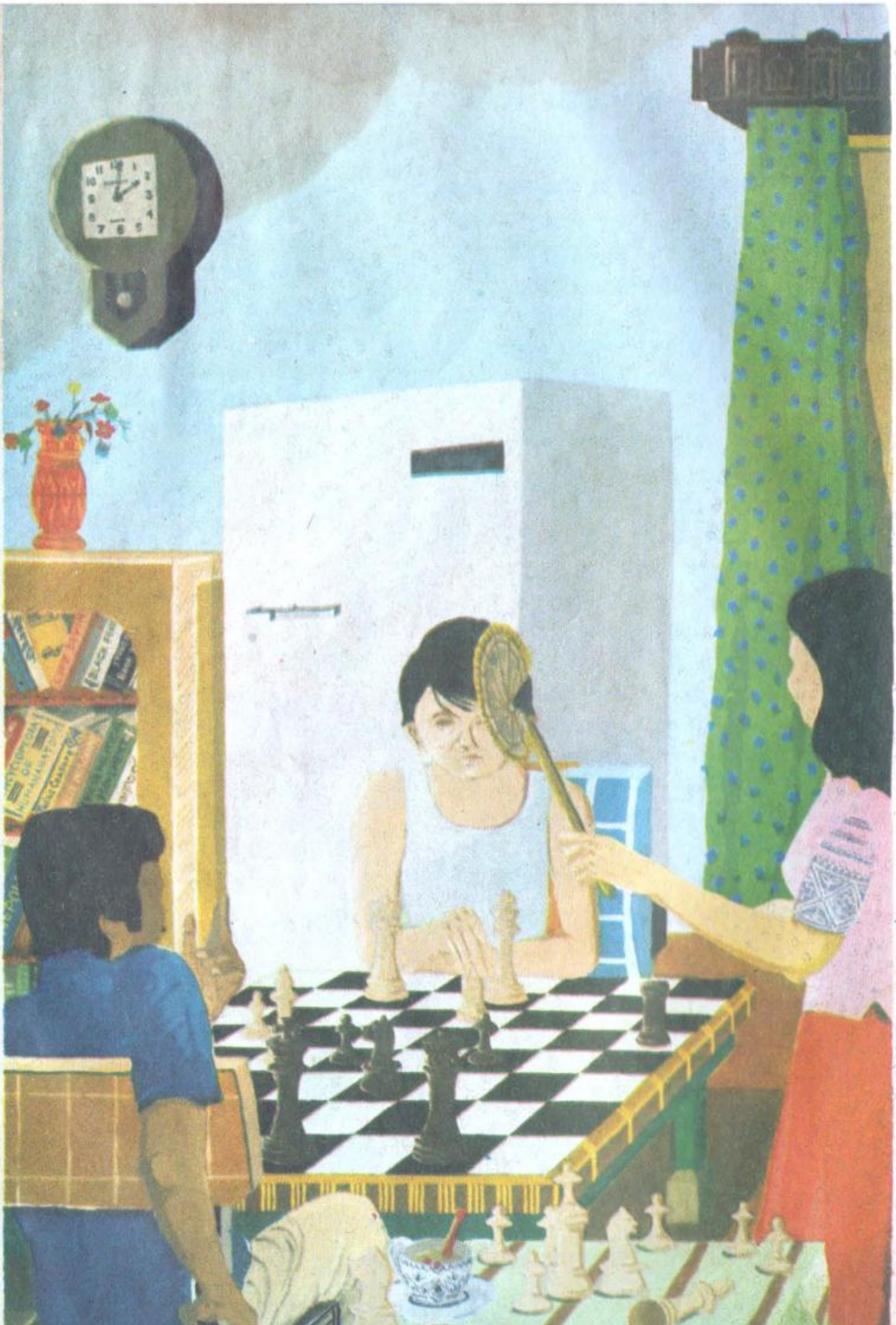

ছবি এঁকেছে **জয়দীপ মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১৩) জাতীয়-মেধা-বৃত্তিপ্রাপ্ত এই তরুণ শিল্পী অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

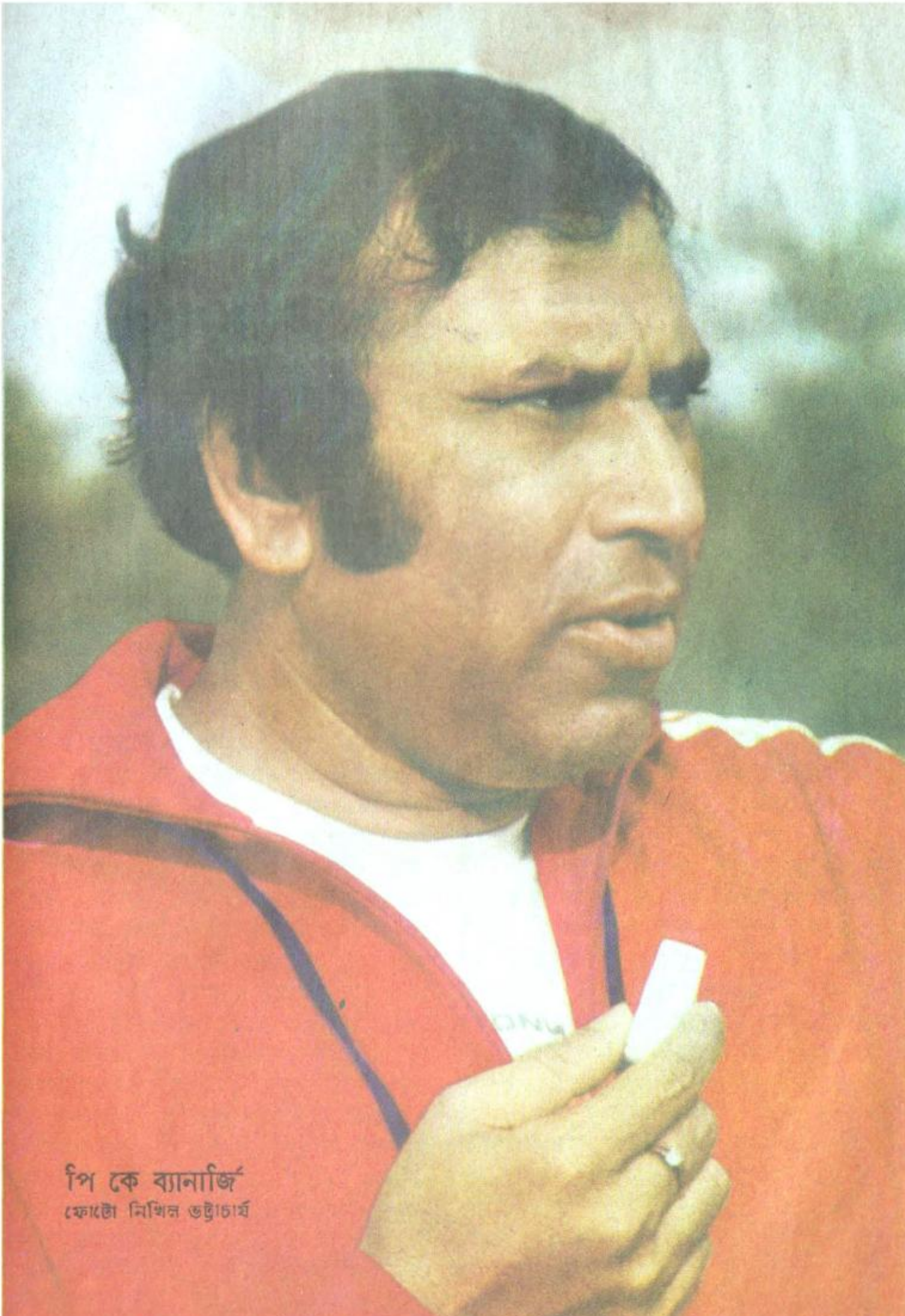

পি কে ব্যানার্জি
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই প্রদীপের পরামর্শ)

বিরাশির প্রস্তুতি কোথায় ?

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
(পি. কে.)

লিখতে বসেই টেস্ট পেপার্সের সেই রচনার প্রশ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, "এই রে! পি কে ব্যানার্জি আবার বল ছেড়ে রচনা নিয়ে লেকচার দিতে এলেন!"

না ভাই, ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। যখন ম্যাট্রিক পড়তাম তখন টেস্ট পেপার্স নিয়ে এখনকার ছেলেমেয়েদের মতোই নাড়াচাড়া করতাম। কোনও এক স্কুলের টেস্টে রচনা লিখতে দিয়েছিল—"দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?" সুপরিচিত দুটি ছত্র। রচনাটা তৈরি করেছিলাম কিনা কিংবা করলেও কাজে লেগেছিল কিনা সে কথা আজ আর মনে নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে ঐ ছত্র দুটির কথা মনে পড়ে গেল। তিন দশক পরে ভারতের মাটিতে আবার এশীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে—১৯৮২ সালে। খুচরো কয়েকটি মাস বাদ দিলে হাতে আর দু'বছর সময় রয়েছে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে না যে, আমাদের কর্মকর্তাদের তথা সমগ্র দেশবাসীর এক সামান্য ভগ্নাংশও এ-নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছেন। শুনেছ কেউ কোথাও কোনও স্কুলে কলেজে কি পার্কে, রেস্তোরাঁয় আলোচনা—'এবার এশিয়ান গেমসে আমাদের ভাল ফল করতেই হবে, না হলে মান থাকবে না'? দেখেছ কি কেউ কোনও পোস্টার যা সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে সেই ক্রীড়াযজ্ঞের কথা?

না। অতখানি সচেতনতা থাকলে তো আমরা কত কী করে ফেলতাম! বলাবাহুল্য, ফুটবল নিয়েই বলছি। শেষ আন্তর্জাতিক সম্মান আমাদের ভাগ্যে জুটেছে বাষট্টি সালে জাকার্তায়। তারপর থেকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাক্ অলিম্পিক প্রতিযোগিতা পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। কিন্তু সেটা আমাদের ক'জনকে লজ্জা দেয়? বরং আমাদের সাধারণ ক্রীড়ামোদীরা তথা এক শ্রেণীর ক্রীড়া-প্রশাসক এক ধরনের গর্ব অনুভব করছেন। বলছেন, "সিঙ্গাপুরের প্রাক্ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আমাদের ফুটবল মানের দারুণ উন্নতি দেখা গেছে। আমাদের বিরুদ্ধে খুবই কম গোল হয়েছে!"

একেবারেই বাজে কথা! আলোচনা করে দেখাই যাক্ সিঙ্গাপুরে কী হয়েছে। সিঙ্গাপুরে ভারত প্রায় পূর্ণশক্তিতে খেলেছে—গৌতম, সুব্রত, সুরজিৎ আর বিদেশ যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত যে ছকে খেলেছে, ভারতের খেলোয়াড়রা সেই ছকের উপযোগী ছিল না। কেন ছিল না, সেটা বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ভারত ৪-২-৪ প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত। এই প্রথায় চারজন ডিফেন্ডার থাকে, যাদের মধ্যে একজন বা দু'জনের আক্রমণমুখী প্রবণতা আছে। মোটমাট, প্রচলিত অর্থের ডিফেন্ডার দু'জন থাকছে, এবং কম করেও দু'জনের গেম-মেকিং এবং ওভারল্যাপিং করার ক্ষমতা থাকছে। মাঝমাঠের দু'জনের একজন অসাধারণ 'গেম মেকার' এবং শুটার আর অপরজন ট্যাকলিংয়ে ও বল কাড়ায় দক্ষ—চরিত্র রক্ষণ-কেন্দ্রিক। আর, চার ফরোয়ার্ডের মধ্যে চারজনই আক্রমণকারী। তা হলেও তাদের মধ্যে একজনকে আত্মরক্ষার কাজে পটু হতে হবে। আর দু'জন মূলত আক্রমণকারী, এবং তারা যে-কোনও জায়গা থেকে যে কোনও পায়ে শট করে গোল করতে পারবে,—যাকে বলে 'স্পেশালিস্ট ফিনিশার'। আর চতুর্থজন হবে বিশুদ্ধ উইঙ্গার। এই ৪-২-২কে যে প্রয়োজনমতো ৪-৩-৩এ বদলে নেওয়া যায়, তা আমরা সকলেই জানি।

এখন আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান ভারতীয় দলের প্রথম সারির ফরোয়ার্ডদের রক্ষণাত্মক খেলার ক্ষমতা খুব সামান্যই আছে বা অনেকের একেবারেই নেই বললেও চলে। হাবিবের পর আর সেরকম কারও নাম তো আমার অন্তত মনে পড়ছে না, যাকে ঐ গুণের অধিকারী বলতে পারি। (অবশ্য উদীয়মানদের মধ্যে এক মিহির বসুর মধ্যে এসব গুণ অল্প হলেও বিদ্যমান।) আর এইরকম একটা দল নিয়ে চারজন ফরোয়ার্ডের দু'তিনজনকে দিয়ে রক্ষণাত্মক খেলা খেলিয়ে গোলসংখ্যা কমিয়ে রাখা

হয়েছে। নরিন্দার, মানস ও জেভিয়ার পায়াসের মতো ফরোয়ার্ড অধিকাংশ সময় পিছিয়ে খেলে 'না হোমে না যজ্ঞে' কাজে লেগেছে। সাব্বির এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তাতে সেও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। সুতরাং আক্রমণকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত এমন একটা সামগ্রিকভাবে রক্ষণাত্মক, নঞর্থক খেলা খেলেছে যেটাতে কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ভারত ৪—২—৪ প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত দল নিয়ে কার্যত ৪—৪—২ প্রথায় খেলেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ১৯৮২-তেও কি ভারত এই কাজই করবে? আমার বিনীত বক্তব্য, করার চেষ্টা করলেও পারবে না — আর কিছু না হোক একটা কারণে। খেলাটা হবে নিজের মাঠে, নিজের কয়েক লক্ষ দর্শকের চোখের সামনে (মাঠে ও টি ভি-তে), যারা সোচ্চার সমর্থন জানাবে অন্তত একটি গোলের জন্যে। তাই দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত মোহনবাগান-আরারাত শীল্ড ফাইনালের কথা মনে পড়ল। আরারাতের বিরুদ্ধে মোহনবাগান একজন সুইপার নিয়ে খেলছিল, এই অবস্থায় আরারাত এক গোলে এগিয়ে যায়। মাঠের অবস্থা যে তখন কী, তা যাঁরা খেলাটা দেখেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন। বুঝলাম, গোল যখন খেয়ে গেছি ডিফেন্স করে কিছু হবে না, 'সারপ্রাইজ অ্যাটাক' করেই দেখি ওদের বিপদে ফেলতে পারি কিনা। নামালাম বিদেশকে। আরারাতের যে রাইট-ব্যাক খেলছিল, সে ততক্ষণ আমার দলের দুর্বল ফরোয়ার্ড-প্লে ও কম খেলোয়াড় নিয়ে আক্রমণ করছি দেখে জায়গা ছেড়ে আক্রমণে বেশি সাহায্য করছিল। সম্পূর্ণ তাজা বিদেশ তার স্বভাবসিদ্ধভাবে ফাঁকা জায়গা পেয়ে দুরন্ত গতিতে ওই জায়গা দিয়ে আক্রমণ শানাল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে খেলার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। আমাদের সমর্থকদের প্রচণ্ড সাধুবাদ এবং হর্ষধ্বনির মধ্যে মোহনবাগান দল ওই দিন ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তি অতি উচ্চ-মানে তুলে ধরতে পেরেছিল। তাই নয় কি?

যে-কথা বলছিলাম। নিজের মাঠে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে না পারলে তো সত্যিই

বডি-ফিটনেসের তালিম দিচ্ছেন পি কে

পি কে (বল নিয়ে এগোচ্ছেন)

লজ্জার কথা। ইংল্যান্ড ফুটবল দল ১৯৫৩ পর্যন্ত নিজের মাঠে কারো কাছে হারেনি। সুনীল গাভাসকার, বিজয় অমৃতরাজ, প্রকাশ পাড়ুকোন বিদেশে ভাল খেলার আগে দেশেই নিজ-নিজ এলাকায় ভাল খেলেছেন। কাজেই এক ধরনের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে খেলতে হবে খেলোয়াড়দের। দেশের মাটিতে দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্য প্রত্যেকের সামনেই থাকবে। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান স্পোর্টিং বা জে সি টি-র খেলায় যতটা আন্তরিকতা তারা ঢেলে দেয়, তার শতগুণ ঢালতে হবে ভারতের খেলায়।

এই গুরুদায়িত্বের কথা মনে রেখেই আমাদের ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসের ফুটবল দল তৈরি করতে হবে। কারা থাকবে সেই দলে? বলাবাহুল্য, ১৯৮০-তে প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় যারা খেলেছে তাদের অর্ধেক খেলোয়াড়ই ১৯৮২-তে বাতিল হয়ে যাবে। কারা তখন আর চলবে না সেটা আমি এই মুহূর্তে বললে কেউ-কেউ সেটাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করতে পারেন, তাই সে-চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। অনেক নতুন মুখ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপেই দেখা গেছে। এর ওপর বাংলার ছেলেরা তো আছেই। এশিয়ান গেমসের আগে আরও যে দুটি করে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, তা থেকেও অনেক নতুন খেলোয়াড় বেরুবে। এছাড়া অবহেলিত জাতীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ততোধিক অবহেলিত আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতাতেও যে-সব প্রতিভা ভাল করে ফুটে ওঠার আগেই অবহেলার তাপে ঝরে যায়, তাদের দিকেও নজর দিতে হবে।

খেলোয়াড় বাছাই করতে গিয়ে খেলোয়াড়দের স্কিল ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া দরকার। তাদের স্বাস্থ্য তথা "ফিটনেস", আর উচ্চতা। উচ্চতার কথা তোলায় অনেকেই অবাক হবেন, কেউ বা ১৯৬৬-র কোরিয়ার দৃষ্টান্ত দেবেন তা জানি। উচ্চতায়-কম খেলোয়াড় যদি সাহসী হয়, যেমন ইন্দর, সুধীর, হাবিব তা হলে উচ্চতার ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে নিতে সে সক্ষম হবে। কিন্তু ইন্দর, সুধীর, হাবিব তো আমাদের দেশে একদম ব্যতিক্রম. মোটেই গন্ডায়-গন্ডায় হয় না। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি থেকে ছ ফুট এক ইঞ্চি হলে সেটাই হবে বাঞ্ছনীয়। খর্বাকৃতি—অর্থাৎ পাঁচ ফুটেরও কম—গোলকীপার, স্টপার ও স্ট্রাইকার চলবে না। একজন উইঙ্গার, একটা সাইড হাফ খর্বাকৃতি হলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। তবে লম্বা লম্বা খেলোয়াড় যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তাহলে আর কী হবে? অবশ্য নজরটা যেন ঐদিকে থাকে।

কী পদ্ধতিতে খেলবে ভারতীয় দল? ফেরেঙ্ক পুসকাসের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে : মাঠের আক্রমণও সেইভাবেই চালাতে হবে, যেভাবে আমরা রণাঙ্গনের আক্রমণ চালাই। যুদ্ধের মতোই ফুটবলেও কি আক্রমণে, কি রক্ষণে সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠতা, বেশি গতি এবং চমক থাকবে যাতে প্রতিপক্ষ কাবু হতে পারে। আবার আত্মরক্ষার সময়েও সংখ্যার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে—রক্ষণভাগে দৃঢ়তা থাকবে, থাকবে গভীরতা।

সেই দিক থেকে ভেবেচিন্তে মনে হয়, ভারতের এখন যা অবস্থা, তাতে বিশেষ একটি পদ্ধতিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। ইরান, ইরাক, কুয়েত, ইসরায়েল চীন ও দুই কোরিয়া ভারতকে এই মুহূর্তে তিন থেকে পাঁচ গোল দিতে পারে। কাজেই দেখতে হবে আমাদের খেলার পদ্ধতিতে যার বড় অভাব, সেই সামঞ্জস্যকে অর্থাৎ আক্রমণ ও রক্ষণের মধ্যে ব্যালান্সকে আনা যায় কী

করে। খেলাটাকে একেবারে রক্ষণাত্মক করলে চলবে না, আক্রমণ করতে হবে। আবার গোঁয়ার্তুমি করে বোকার মতো সবাই মিলে আক্রমণ করতে গিয়ে গোল খেলেও চলবে না। সুতরাং আমাদের চাই এমনই এক পদ্ধতি যা রক্ষণভাগকে দেবে নিশ্ছিদ্র প্রত্যয়, মাঝমাঠে বিপক্ষের আক্রমণকে খর্ব করার ক্ষমতা ও নিজ দলের নব-নব বিচিত্রধর্মী আক্রমণ শানাবার উৎস আর ফরোয়ার্ডকে দেবে ঝড়ের গতি ও নিশ্চিত গোল করার এবং দলকে জয়লাভের পথে এগিয়ে দেবার সঙ্গতি। দেখা যাচ্ছে ১—৩—৩—৩ পদ্ধতিই আমাদের কাজ দেবে। এটা রক্ষণমূলক 'ক্যাটেনাসিও' পদ্ধতির একটি পরিবর্তিত রূপ, এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে। বিশুদ্ধ ক্যাটেনাসিও পুরোপুরি রক্ষণাত্মক বলে নিন্দিত। তা ছাড়া সেরকম প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে "ক্যাটেনাসিও"তেও কাজ দেয় না। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ১৯৭০ সালের বিশ্ব-কাপ ফাইনাল। ক্যাটেনাসিওর আবিষ্কারক ইতালি কীরকমভাবে ব্রাজিলের কাছে পর্যু-দস্ত হয়েছিল, সেটা কে না জানে। কিন্তু আমি যে পদ্ধতির কথা বলছি সেটা অনেকাংশে স্থিতিস্থাপক—অর্থাৎ দলের ও খেলার চরিত্র অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করে নেওয়া যেতে পারে। পদ্ধতিটা মোটা-মুটি এইরকমভাবে কাজ করবে। যখন দল রক্ষণে ব্যস্ত থাকবে তখন সব-কটি ফরোয়ার্ড খেলোয়াড়কে স্পষ্টভাবে মার্ক করা যাবে, এবং একজন পশ্চাৎবর্তী স্টপার 'সুইপার'-এর কাজ করবে, আবার আক্রমণের ক্ষেত্রে উপরে উঠে এসে যে-কোন সারিকে জোরদার করতে পারবে। পৃথিবীর কোন টীমই আজ আর তিনজনের বেশি ফরোয়ার্ডকে এগিয়ে রাখার বিলাসিতা দেখায় না, এমন-কী বেশির ভাগ দলই দুই ফরোয়ার্ড সামনের সারিতে খেলায়, বাকি খেলোয়াড় পেছন থেকে ঝটিকা আক্রমণে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় ফিরে আসে। ওপরের ছকে আয়ত-ক্ষেত্র মাঠটি সমান ভাবেই খেলোয়াড় দিয়ে ভরাট থাকবে। যে-কোন রণনীতির মোকা-বিলায় এ-পদ্ধতি কাজের হবে, এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয় খেলার ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রানুগ খেলা খেলতে পারবে।

আগামী সংখ্যা থেকে

পি. কে.র আত্মকথা

উইং থেকে গোল

ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হবে।
তাতে থাকবে
নাটকীয় অনেক
ঘটনার বৃত্তান্ত এবং
তাক-লাগানো অনেক খবর!
বাড়িতে যিনি কাগজ দেন,
এখুনি তাঁকে বলে রাখো।

বর্গ এখনই কিংবদন্তী

অরিজিৎ সেন

খেলার মাঠে এক-এক করে অনেক বীর এসেছেন, অনেকেই দর্শকদের সামনে ক্রীড়া-কৌশলের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, কিন্তু খেলোয়াড়-জীবনেই কিংবদন্তী হয়েছেন একমাত্র বিয়র্ন বর্গ।

বর্গের বয়স মাত্র ২৪। এই বয়সেই বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন তিনি। পর-পর পাঁচবার পৃথিবীর সবচেয়ে লোভনীয় টেনিস পুরস্কার—উইম্বলডনের সিঙ্গলস খেতাব—তিনি পেয়ে গেছেন। এটা অবশ্য অল-ইংল্যান্ড ক্লাবের রেকর্ড নয়। ১৮৭৭ সালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবার পরে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত সিঙ্গলস খেতাব জেতেন উইলিয়াম রেনশ। তবে তখন প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, এবং আগের বছরের চ্যাম্পিয়নকে খেলতে হত একটি মাত্র ম্যাচ।

এখন প্রতিযোগীর সংখ্যা এত বেশি যে, উইম্বলডনের মূল প্রতিযোগিতায় আসার জন্য আলাদা একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। তা ছাড়া, সারা বিশ্বে মোটা টাকার অঙ্কের খেলার ছড়াছড়ি। সব জায়গাতেই বড়-বড় খেলোয়াড়দের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াতে হয়। তবে উইম্বলডনে স্নায়বিক চাপ সবচেয়ে বেশি, কারণ এটাই হল টেনিসের মক্কা। এখানে একবার জিততে পারলেও যে-কোনো টেনিস-

বিয়র্ন বর্গ

খেলোয়াড় নিজেকে ধন্য মনে করেন।

তাই, সুইডেনের সোনালি চুলের বর্গকে রূপকথার রাজপুত্রের মতোই মনে হয়। তাঁর হাতে যেন জাদুদন্ড আছে। যেখানেই খেলেন, সেখানেই জেতেন।

বর্গ যেবার প্রথম উইম্বলডনে খেলেন, সেবার তিনি জুনিয়ার প্রতিযোগিতা থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাল ফল সে-খেলায় হয়নি, মিশরের এল-শাফেইয়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর তাঁর সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। কুড়ি বছর বয়স থেকে জিততে শুরু করেছেন একটানা। শুধু তাই নয়, আজ এক বছরের ওপর হল, কোনো একক প্রতিযোগিতায় বিশ্বের কোনো খেলোয়াড় বর্গকে হারাতে পারেননি।

১৯৭৮ সালে খুব সহজেই জিমি কনরসকে হারিয়ে বর্গ পরপর তিনবার উইম্বলডন খেতাব পান। কিন্তু পরের বছর তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। তৃতীয় রাউন্ডে বিজয় অমৃতরাজ জয়ের মুখ থেকে সরে আসেন। ফাইনালে রসকো ট্যানার পঞ্চম সেটে এসে হার মানেন।

এ বছর বর্গকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি প্রথম দিকে, কিন্তু ফাইনালে ভয়ংকর এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। সেন্টার কোর্টের ১৬,০০০ এবং টেলিভিশনের লক্ষ-লক্ষ দর্শক রুদ্ধশ্বাসে বসে মরণপণ এক লড়াই দেখে। এই প্রথম একুশ বছরের বাঁ-হাতি খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো ফাইনালে ওঠেন। প্রথম থেকেই তিনি এত চমৎকারভাবে লড়ছিলেন যে, মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল, তিনি বোধহয় এবার বর্গ-স্রোতকে রোধ করতে পারবেন।

প্রথম সেটেই প্রচন্ড সার্ভ এবং ভলির সাহায্যে ৬—১ গেমে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় সেটে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫—৭ গেমে হারেন। তৃতীয় সেটে বর্গের সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে ৩—৬ গেমে হারেন। কিন্তু

জন ম্যাকেনরো

ম্যাকেনরো প্রধানত প্রচন্ড সার্ভিসের সাহায্যে ৭—৬ গেমে চতুর্থ সেট জিতে খেলার সমতা ফিরিয়ে আনেন। এই চতুর্থ সেটটি উইম্বলডন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। টাইব্রেকারে দুই লড়াকু খেলোয়াড় ৩৪ পয়েন্ট খেললেন। ইদানীং এত জোর লড়াই দেখা যায়নি। পঞ্চম সেটে বর্গ ৮—৬ গেমে জিতলে চিরপরিচিত ঢঙে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই খেলায় জেতা-হারার চেয়েও বড় ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সিংহের লড়াই তো আর প্রতি বছর দেখা যায় না। খেলাটি চলেছিল ৩ ঘন্টা ৫৩ মিনিট ধরে।

পুরুষদের সিঙ্গলসের আগের দিন মহিলাদের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও জোরালো ধরনের লড়াই। প্রতি-যোগীরা নতুন না হলেও একসঙ্গে ফাইনালে অনেক দিন আসেননি। আমেরিকার ক্রিস এভারট লয়েড, ব্রিটেনের জন লয়েডের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হওয়ার ফলে অনেকেই ভেবেছিলেন টেনিস কেরিয়ার তাঁর শেষ হয়ে গেছে, তিনি গতবারের চ্যাম্পিয়ন মারটিনা নাভরাটি-লোভাকে সেমিফাইনালে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন ইভন গুলাগং-কলির সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়ার এক উপজাতি সম্প্রদায়ের এই মহিলা এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা।

ইভন ১৯৭১ সালের পর আবার উইম্বলডনে খেতাব পেলেন। আর ক্রিস? পরপর তিনবার ফাইনালে উঠেও হারলেন। দুবার চ্যাম্পিয়ন ক্রিসের ভাগ্যই খারাপ বলতে হবে। প্রথম সেটে ৬—১ গেমে হেরে তিনি যখন সত্যি ভাল খেলতে আরম্ভ করলেন, তখন আর ইভন্‌কে ধরে রাখা গেল না। সামান্য একটু ভুলের জন্য টাই ব্রেকারে ৬—৭ গেমে ক্রিস হেরে গেলেন। এই সেট জিতলে ক্রিস খুব সম্ভবত পরেরটিও জিততেন।

পুরুষ এবং মহিলাদের ডাবলসের খেলা দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও মিক্সড ডাবলসে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ, এই প্রথম ভাই-বোনের জুটি এই খেতাব পান। আমেরিকার উদীয়মান তারকা ট্রেসি অস্টিন তাঁর ভাই জনের সঙ্গে জুটি বেঁধে মার্ক এডমন্ড্‌সন এবং ডায়ানা ফ্রমহোল্টজকে ৪—৬, ৭—৬, ৬—৩ সেটে পরাজিত করেন।

ক্রিকেটের হ্যাটট্রিক

মণীশ মৌলিক

টেস্ট ক্রিকেটের হ্যাট্‌ট্রিকের গল্প শুরু করলে প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে, তিনি হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার 'জন' ম্যাথুজ। দোহারা চেহারার এই বোলারটি মাত্র আটটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর সংগ্রহে মোট ১৬টি উইকেট। হিসেবে চোখ বোলালে ম্যাথুজকে দারুণ বোলার বলে মনে হয় না। কিন্তু ম্যাথুজ ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের হ্যাট্‌ট্রিকের পাতায় এক নম্বর হয়ে আছেন।

১৯১২ সালের ঘটনা। বিখ্যাত ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে খেলা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বেশ ভালই খেলছে ব্যাটসম্যানরা। বাঘা-বাঘা অস্ট্রেলীয় বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা অবলীলায় পিটিয়ে যাচ্ছিল তাদের। হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনের কী মতলব হল, তিনি ম্যাথুজকে বল করতে দিয়ে বললেন, "হাড়জ্বালানে ব্যাটসমান দুটোর একটাকে ভাগাও তো!" ম্যাথুজ ক্যাপ্টেন নোবেলের কথা রেখেছিলেন—একজন নয়, পর পর তিনজন ব্যাটসম্যানকে ভাগিয়ে দিয়ে।

প্রথম বলে বিউমণ্টের বেল উড়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে পেগলার আর ওয়ার্ড লেগ বিফোর উইকেট হলেন।

নোবেল জড়িয়ে ধরলেন ম্যাথুজকে। গল্প কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা আবার ব্যাট করতে নামল। আবার হাত ঘুরিয়ে ভেল্‌কি দেখালেন ম্যাথুজ। আর একটি হ্যাট্‌ট্রিক। টেলারের তে-কাঠির দুর্গ ভেঙে চুরমার। আর স্কোয়ার্জ এবং ওয়ার্ড কট অ্যান্ড বোল্ড। নোবেল তো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে অস্থির। সতীর্থরা অভিনন্দনে মুখর। কিন্তু একদিনে দুটি ইনিংসে হ্যাট্‌ট্রিকের অধিকারী ম্যাথুজ খুব একটা হৈ-চৈ করলেন না। মুখে কেবল পরিচিত সেই মিষ্টি হাসি।

ম্যাথুজ এই দুটো হ্যাট্‌ট্রিক করতে কিন্তু কোনো ফীল্ডারের সাহায্য নেননি। দুটো

বোল্ড, দুটো এল বি ডবলিউ আর দুটো কট অ্যান্ড বোল্ড। আর কোনো বোলার কিন্তু ফীল্ডারের সাহায্য ছাড়া হ্যাট্‌ট্রিক করতে পারেননি। একদিনে দুটো হ্যাটট্রিক, একটি টেস্টের দুটি ইনিংসেই হ্যাট্‌ট্রিক, কোনো ফীল্ডারের সাহায্য ছাড়াই দুটি হ্যাটট্রিক, এমন কৃতিত্ব টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে আর কারও নেই।

ইংল্যান্ডের সাতজন, অস্ট্রেলিয়ার চারজন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুজন নিউ-জিল্যান্ডের একজন ও দক্ষিণ আফ্রিকার একজন—মোট পনেরোজন টেস্টে হ্যাট্‌ট্রিক করেছেন।

১৮৮২-৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে ডব্লু বেটস হ্যাটট্রিক করেছিলেন ৭।২৮। জেমস ব্রিগস এই অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৯১-৯২ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৮৯৫-৯৬ সালে পোর্ট এলিজাবেথ মাঠে জর্জ লোম্যান ভেল্‌কি দেখিয়েছিলেন। একটি হ্যাট্‌টিক-সহ তিনি আটটি উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র সাত রানের বিনিময়ে। ১৮৯৯ সালে হার্থে হেডিংলেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ক্রাইস্টবার্চ মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯২৯-৩০ সালে অ্যালোম একটি হ্যাটট্রিকসহ আটত্রিশ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করেছিলেন। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী গডার্ড জোহান্সবার্গে (৩৮-৩৯) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পর-পর তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে লোডার হেডিংলেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন (৬। ৩৬)। তার মধ্যে একটি হ্যাটট্রিক ছিল।

ম্যাথুজের কথা তো আগেই বলেছি। এছাড়া ট্রাম্বেলও দুটো হ্যাটট্রিক করে-ছিলেন। দুটো মেলবোর্নে এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। একটা ১৯০১-২ সালে এবং আর একটা ১৯০৩-৪ সালে। স্পফোর্থও হ্যাটট্রিক করেছিলেন এই মেলবোর্নেই। ১৮৭৮-৭৯ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ক্লাইন হ্যাট্‌ট্রিক করেছিলেন কেপ টাউনে। ৫৭-৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাত্র দুজন হ্যাট্‌ট্রিক অর্জন করেছেন। দুজনেই বিখ্যাত বোলার। একজন ফাসট বোলার ওয়েসলি হল ও অপরজন স্পিনার লান্স গিবস। পাকি-স্তানের বিরুদ্ধে লাহোরে ৫৮-৫৯ সালে হল হ্যাটট্রিক করেছিলেন। গিবসের হ্যাট-ট্রিক এসেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জি এম গ্রিফিন ১৯৬০ সালে হ্যাটট্রিক পেয়ে-ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এটিই হল একমাত্র হ্যাটট্রিক।

ইংল্যান্ডের অ্যালোমের মতো নিউ-জিল্যান্ডের পেথোরিকও জীবনের প্রথম টেস্টেই হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এটা চার বছর আগের কথা। পাকিস্তান সফরে গিয়েই পেথেরিক এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছিলেন।

ভুল শুধরে নাও। ২ জুলাই তারিখের পাক্ষিক আনন্দমেলার ১১ পৃষ্ঠার নীচের দিকে ছাপা হয়েছে—'জেনারেল আইজেনহাওয়ার তখন ইংল্যান্ডের নর্মান্ডিতে, সেখান থেকে ফ্রান্সের উপকূলে গিয়ে....'। ছাপার ভুলে শব্দগুলো উল্টে-পাল্টে বসেছে। আসলে হবে 'জেনারেল আইজেনহাওয়ার তখন ইংল্যান্ডের উপকূলে, সেখান থেকে ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে গিয়ে....'।

টাকা বলতে আমরা বুঝি চকচকে গোল চাকতি আর নয়তো সরকারি ছাপ-মারা ছোট-বড় কাগজ, যা দিয়ে জিনিস কেনা যায়। এই ধরনের টাকা চালু হবার আগে কিন্তু মানুষ এমন অনেক কিছু দিয়ে জিনিস কিনত, যা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। যেমন ধরো, চা, শস্যের দানা, নুন, পশুলোম, কোদাল, এমনকী আফিং। এ সবই টাকা হিসেবে কোথাও-না-কোথাও কোনও-না-কোনও সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন কালে রোমে গরু-বলদ ইত্যাদি টাকার কাজ করত, সম্পদের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক টাকার কথা তো এখনও বলাই হয়নি। বোর্নিও দ্বীপে এক আদিম জাতি থাকে। তাদের টাকা মড়ার মাথার খুলি : যে যত জমাতে পারবে, সে তত বড়লোক।

ডাফরিন ও সেই লোকটি

সুরেশচন্দ্র কুমার মজুমদার

ইংরেজ শাসককুলের শিরোমণি লর্ড ডাফরিন ছিলেন যেমন সুপুরুষ তেমনি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। চার বছর তিনি ভারতের 'ভাইসরয়' ছিলেন। কার্যকাল শেষ হলে ইংরেজ-সরকার তাঁকে পুনরায় আর একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল করেন। তাঁর জন্য নির্ধারিত হয় প্যারিসের রাষ্ট্রদূতের পদটি। ফ্রান্সে যাওয়ার আগে ডাফরিনের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-যুগের অনেক নামকরা মনোবিজ্ঞানী বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যের সমাধান করতে পারেননি। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন মার্কিন লেখক লুই কে আনসপাচার।

প্যারিস রওনা হওয়ার কয়েক মাস আগে ডাফরিন তাঁর প্রিয় বন্ধু লর্ড হেনরির কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তাতে লেখা— "আয়ারল্যাণ্ডে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরকে চাঙ্গা করে তোলো। আবহাওয়া চমৎকার, ছুটি ভালই কাটবে।" নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে ডাফরিন চলে এলেন আয়ারল্যাণ্ডের গ্রামে। পল্লী অঞ্চলে, শান্তির নীড়ে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল। কিন্তু অঘটন ঘটল আয়ারল্যাণ্ড ছাড়ার আগের রাতে।

সেদিন দুপুরে শিকার, খেলাধুলা ও ঘোরাঘুরি হয়েছে অনেক। নৈশ-ভোজ সমাপন করে ডাফরিন যখন শয্যার আশ্রয় নিলেন তখন তিনি বেশ ক্লান্ত। মাঝ-রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভাঙতেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চাঁদনি রাত। একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল। মনে হ'ল কেউ যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শব্দটা একটানা নয়, কিন্তু থেকে-থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডাফরিন। সামনের লনে বড় বড় ওক ও পপলার গাছ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে, তার আড়াল থেকে জ্যোৎস্নার আলো একফালি জমির ওপর পড়ে আলো-ছায়ার অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। উত্তুরে হাওয়া বইছে শন-শন করে, তার দাপটে হাড়েও বুঝি কাঁপন ধরায়। একটা ডালে পেঁচা বসে ছিল, হঠাৎ সেটা ডেকে উঠল বিশ্রী স্বরে। আর ঠিক তখনই শোনা গেল সেই চাপা গোঙানি, এবার যেন খুব নিকটে।

ডাফরিন ভাবলেন, কেউ হয়ত কোনো দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে, এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। অন্ধকারের দিকে একটু এগোতেই দেখলেন, বড় ওক গাছটার আড়াল থেকে অদ্ভুত ধরনের একটা লম্বা লোক। বড় রকমের একটা বোঝা ঘাড়ে নিয়ে লোকটা বেরিয়ে এল। বোঝার ভারে লোকটি এতই নুয়ে পড়েছে যে, ভাল করে তার মুখ দেখাই যায় না। ডাফরিনের মনে হল, বোঝাটা কফিন, তারই ভারে সে কাতরাচ্ছে। লোকটা কি কফিন-চোর? মনে এমন সন্দেহ হওয়াতে ডাফরিন বেশ জোর গলায় হাঁক দিলেন, "ওহে, তোমার মাথায় ওটা কিসের বোঝা? কী নিয়ে পালাচ্ছ দেখি একবার।"

লোকটি যেন চমকে উঠল, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা একবার ডাফরিনের মুখের দিকে তাকাল। ডাফরিন শিউরে উঠলেন। কী পৈশাচিক সেই দৃষ্টি! কী হিংস্র মুখের ভাব! বেশিক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকানো যায় না। তিনি আর এগুতে পারলেন না, মনে হল আপনা থেকে তাঁর পা যেন নিশ্চল হয়ে আসছে। কিন্তু, প্রচণ্ড তাঁর মনের সাহস।

এবার তিনি কড়াগলায় শুধোলেন, "কফিন ঘাড়ে রাতদুপুরে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?" এবারও কোনো উত্তর নেই। ডাফরিনের রোখ চেপে গেল, ছুটে গিয়ে তিনি লোকটির পথ রোধ করে দাঁড়াতে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সব ফর্সা, ভোজবাজির মতো কোথায় মিলিয়ে গেল লোকটা।

ডাফরিন পরিষ্কার দেখেছিলেন লোকটি তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে, অথচ ধরতে গিয়েই আর নাগাল পেলেন না। চারিদিক ভাল করে খুঁজে দেখলেন, কোথাও কোন জন-মনুষ্য নেই। নিশুতি রাত, সমস্ত পৃথিবী ঘুমে

অচেতন। যে মাটির ওপর লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল শিশির-ভেজা সে জায়গাতেও কোন পদচিহ্ন পড়েনি। নিশি-পাওয়ার মতো এক ঘোরের অবস্থায় ডাফরিন আবার ফিরে এলেন তাঁর নিজ কক্ষে। সবটাই কি তাঁর মনের ভুল, মধ্য-রাত্রের দুঃস্বপ্ন! শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবলেন, কিন্তু রহস্যের কোনো কিনারাই করতে পারলেন না।

সকালে চায়ের টেবিলে বন্ধুবান্ধবরা তাঁর মুখ থেকে গত রাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে হাসি-ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠলেন। ঠাট্টা-রসিকতায় ডাফরিন সায় দিতে পারছিলেন না। গতরাত্রের ঘটনা তাঁর কাছে এতই জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ যে, একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডাফরিন এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে লণ্ডনে ফিরে এলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁর নূতন কর্মস্থল প্যারিসে। কূটনৈতিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। নূতন ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা হ'ল প্যারিসের এক নামী হোটেলে।

ডাফরিন যথাসময়ে হোটেলে এসে উপস্থিত হলেন। পাঁচ-তলার অভ্যর্থনা-কক্ষে বিশাল আয়োজন। উদ্যোক্তারা ডাফরিনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন লিফটের সামনে। লিফটে যখন তিনি প্রবেশ করতে যাবেন তখন ঘটল এক অঘটন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে ডাফরিন দেখলেন, লিফটম্যান হিসাবে যে ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে হচ্ছে সাক্ষাৎ সেই যমদূত, যাকে তিনি কয়েকমাস পূর্বে গভীর রাত্রে আয়ারল্যাণ্ডের গ্রামে দেখেছেন। লোকটির দৃষ্টি হিংস্র কিন্তু ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক হাসি।

হঠাৎ কী কেন মনে হওয়ায় ডাফরিন সরে দাঁড়ালেন। সঙ্গীদের বললেন, তিনি এখন যাবেন না, দশ মিনিট বাদে উঠবেন। ডাফরিনের আচরণে অনেকেই অবাক হলেন। অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল। সেই ফাঁকে ডাফরিন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে এলেন হোটেলের অফিস-ঘরে। উদ্দেশ্য—ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করা, লিফটম্যানটি কে? কিন্তু বেশি দূর তাঁকে যেতে হল না। শোনা গেল বিরাট এক

পতনের শব্দ।

ডাফরিনের একান্ত সচিব ছুটে এসে জানালেন যে, বিরাট এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একতলা থেকে পাঁচতলা যাওয়ার পথে তার ছিঁড়ে লিফট নীচে আছড়ে পড়েছে, আরোহীরা সবাই প্রায় মারা গেছে পিষ্ট হয়ে। এই লোমহর্ষক দুর্ঘটনার বিবরণ সব বড়-বড় সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছিল। অল্পের জন্য কীভাবে ডাফরিন বেঁচে গেলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হ'ল। এই দুর্ঘটনায় যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল সেই রহস্যজনক লিফটম্যান।

অনেক চেষ্টা করেও ডাফরিন তার আসল পরিচয় বার করতে পারেননি। আশ্চর্যের কথা, হোটেল-ম্যানেজার তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, লোকটি হোটেলের কর্মী নয়, এবং একে আগে কখনও তাকে দেখাও যায়নি। এই অজ্ঞাত-পরিচয় লোকটির জন্য ডাফরিন অপঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, কিন্তু লোকটি যে কোন জগতের বাসিন্দা আজও সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

ছবি সুনীল শীল

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

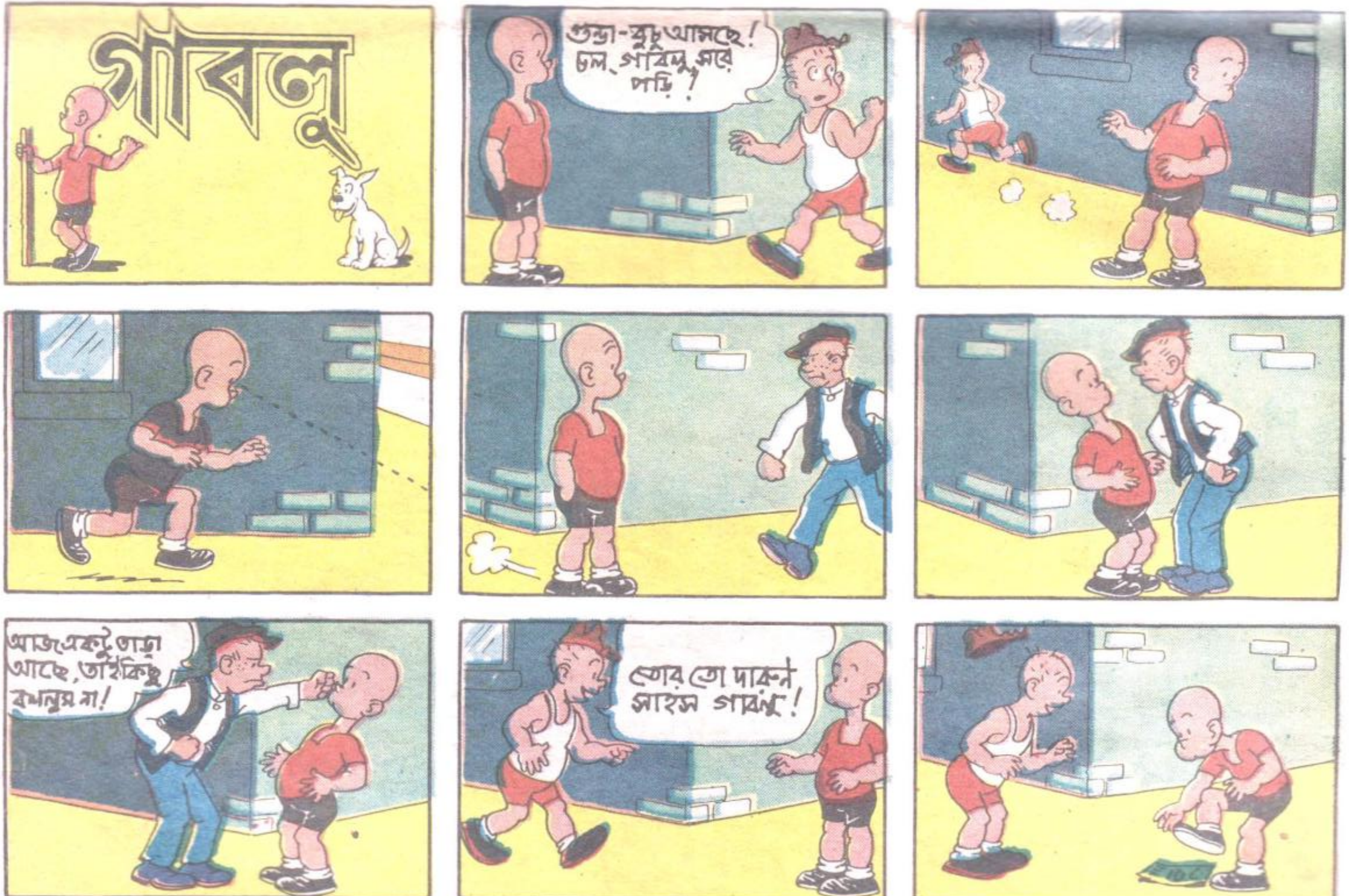
গাবলু
গুন্ডা-স্বচু আসছে! চল, গাবলু, সরে পড়ি!
আজ একটু তাড়া আছে, তাই কিছু বললুম না!
তোর তো দারুণ সাহস গাবলু!

বিয়েবাড়ির গয়না

কুন্তক

আচ্ছা কাকু, কৌশল-শব্দটা তোমরা যেমন করে বললে, মনে হল কথাটা খারাপ। খারাপ?

কেন মনে হল তা?

ওই-যে, ছল আর বলের সঙ্গে মিলিয়ে বললে। আর, কেমন যেন তাচ্ছিল্য করে বললে!

ঠিকই ধরেছিস, শব্দটার একটা খারাপ দিক আছে। ওর মধ্যে একটা নিপুণতার কথা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গেই আছে না একটা ফন্দি একটা চালাকি একটা কায়দারও কথা?

তো, সাজিয়ে বলাটা তো একরকম কায়দা করেই বলা। মধুসূদন যদি তেমন করে বলে থাকেন তো তাঁকেই কেন দোষ দিচ্ছ শুধু? সকলেই তো করেন তা?

নন্তু বলল ঃ সকলেই কি আর কথায় কথায় বলেন 'কী কৌশলে রাক্ষসভরসা/ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে...' ইত্যাদি ইত্যাদি?

ও, ওই শব্দটা একবার বলেছেন বলে?

একবার? একশোবার পাবি এটা মেঘনাদবধ কাব্যে। অবশ্য পড়িস যদি। ও-বই পড়া বেশ শক্ত। কাকু পড়েছে সবটা?

ফাজলামি করিস না। কিন্তু না রে টুম্পি, কেবল ওই শব্দটা আছে বলেই নয়। কৌশল কেন মনে হয় জানিস? একরকম লেখা আছে যা পড়লেই বেশ বোঝা যায় যে, এই-যে, মস্ত একটা কায়দা হল এখানে।

ভাল না সেটা?

না, এ তেমন ভাল না। দিদিমণি যদি তোকে বলেন, 'আত্রেয়ী, সুন্দর করে বাংলা লেখো', আর তুই যদি সঙ্গে-সঙ্গে ডিকশনারি খুলে কিছু সুন্দর-সুন্দর আর শক্ত-শক্ত শব্দ বসাতে শুরু করিস, তাহলেই কি লেখা ভাল হবে?

হবে না? আমি তো ভেবেছিলাম হবে।

না, একেবারেই হবে না। সহজ হওয়াটাই সবচেয়ে ভাল। বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখেছিলেন, অনেক মেয়ের ধারণা প্রচুর গয়না পরলেই সুন্দর দেখায়। দেখায় কি তা?

নন্তু টিপ্পনী কাটে ঃ বিয়েবাড়িতে না গেলে এ বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

টুম্পি বলে ঃ বেশ বলা যায়। সারা গায়ে গয়না পরলে আমার বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।

হ্যাঁ। কেননা তখন গয়নাটাই দেখা যায়। মানুষটা ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু এর সঙ্গে লেখার কী?

লেখাও তো ওই রকম। সাজিয়ে বলাটা যদি বড্ড বেশি জানান দিতে থাকে তো ভাল লাগে না আর। মানুষটা চাপা পড়ে যায়।

লেখার মধ্যে আবার মানুষ কোথায়?

বা রে, লেখার মধ্যে তো মানুষই থাকে। লেখা পড়ে মনে হয় না, কারো সঙ্গে কথা বলছি? কারো যেন কথা শুনছি? স্বর শোনা যায় না একটা?

একটু ভেবে টুম্পি বলল ঃ হ্যাঁ, তা সত্যি মনে হয় অনেক সময়ে। তো, কৌশল বুঝি ঢেকে দেয় সেটা? তাহলে তুমি এতদিন ধরে সেইসব কৌশলের কথাই শেখাচ্ছ কেন? সাজিয়ে বলার কথাই তো বলছ কেবল।

তা অবশ্য বলছি। বলিনি একদিন, একটা সত্যি কথা ঠিকমতো বলতে গেলেও অল্পস্বল্প সাজিয়ে বলতে হয় অনেক সময়ে? কাজেই, কৌশল মাত্রেই যে খারাপ তা নয়। তবে কী জানিস, কৌশলটা লুকোনোই হল সবচেয়ে বড় কৌশল। লেখাটাকে যেন বিয়েবাড়ির গয়না মনে না হয়, সেইটে তো শিখতে হবে?

ছুটির আগে ছুটির কথা

প্রসাদ

কাল থেকে চম্বলদের ইস্কুল দিন পনেরোর জন্যে বন্ধ। বড়দিনের ছুটি। ইংরেজির ক্লাসে আজ তাই নিয়েই কথাবার্তা হল। শ্রীচারুচন্দ্র ধর ইংরেজি পড়ান।

Mr. Dhar: Well, boys, let us talk about the holidays, shall we? I'm sure you're all going to have a good time.

Boys : Oh, yes, Sir!

Mr. Dhar : And do a little work, too, everyday.

Nanda (sadly, to himself): I knew he was going to spoil it.

Mr Dhar: However, let's forget about work at this moment and turn to other matters. You, Nanda, did I hear you muttering to yourself? Please speak up and let us share your thoughts.

Nanda : I was only saying, Sir, that a little work never did anybody any harm.

Mr. Dhar: Most gratifying, coming from you. And that earns you the right to speak first. Tell us, what are you doing during the holidays, apart from working, of course?

Nanda : I don't know for certain, Sir. My father says we might spend a few days at Puri. But he's usually very busy this time of the year and can't say if he can get away.

*Mr. Dhar*s: Well, let's hope for the best. And now, Amal, it's your turn to speak. Tell us your hopes about the holidays. Are you going anywhere?

Amal : I'm leaving for Bombay tomorrow Sir, with my mother and younger brother. Father will join us a week later.

Mr. Dhar : That sounds very nice. But tell us more. Where will you stay in Bombay? Will you stay in a hotel?

Amal: No, Sir. Father says good hotels are very expensive. We'll put up in a guest house.

Mr. Dhar : Are you going by train or by air?

Amal : By train, Sir. Father says we'll save a good deal of money, if we go by train.

Mr. Dhar : And you'll enjoy it much more too, I'm sure. You'll see much more of the country that way. Air journeys are for people who are in a great hurry. And you know, less hurry means more fun while you're travelling.

কিন্তু এসব কথা শোনার পরেও অমলের মুখ দেখে মনে হল সে এরোপ্লেনে যেতে পারলেই বেশি খুশি হত। যাই হোক, আজকের কথাবার্তায় তিনটে ক্রিয়াপদের ব্যবহার আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করব :

say, speak, talk, tell.

ওপরের যে-যে বাক্যে এই শব্দগুলো লেগেছে, সেই সব বাক্য আলাদা করে লেখো। তারপর ভেবে দেখো, এই শব্দগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কোথায় ব্যবহার হয়, বুঝতে পারো কি না।

এ নিয়ে সামনের বার আরো কথা হবে।

বাঘা

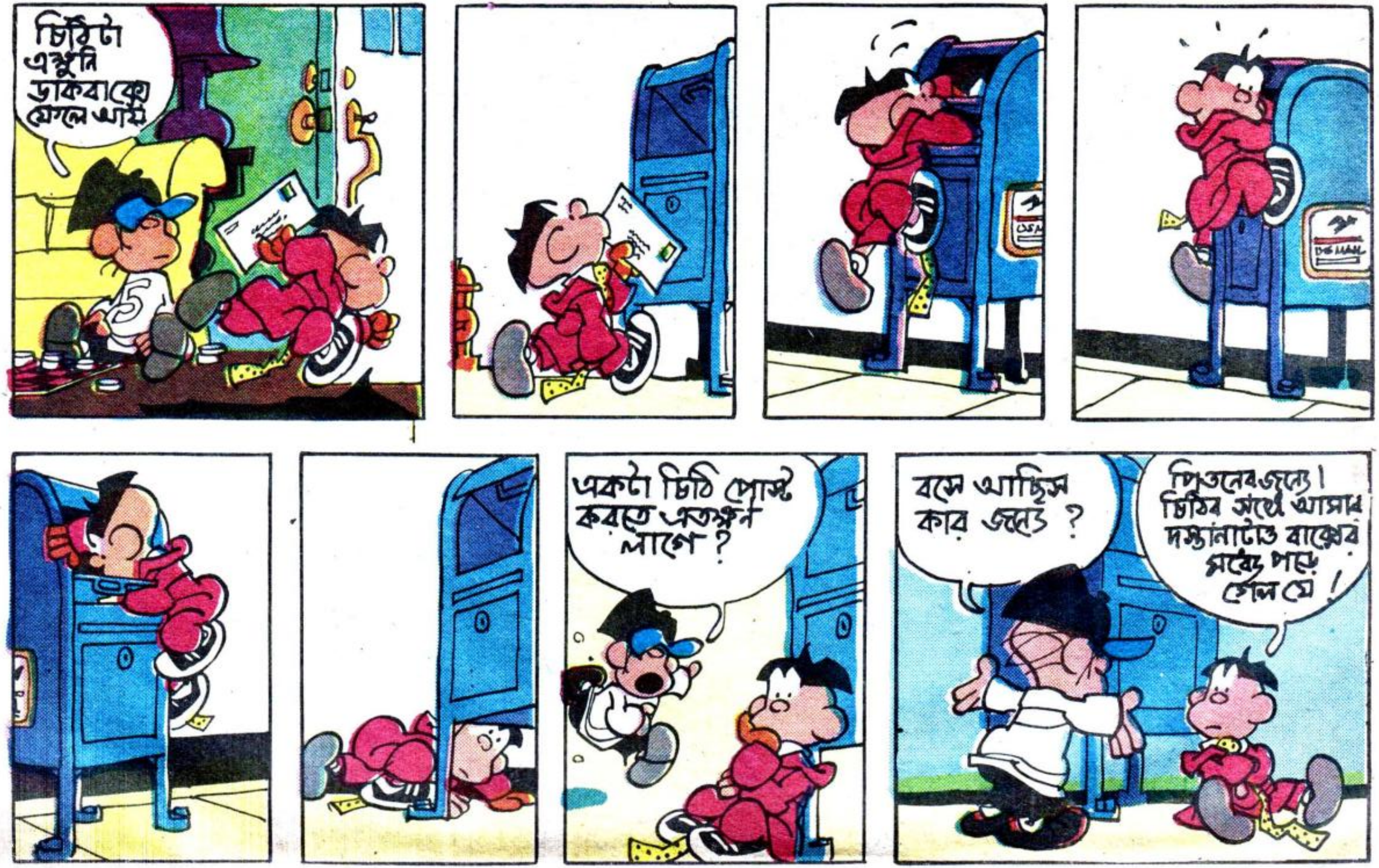
চিঠিটা এক্ষুনি ডাকবাক্সে ফেলে আয়
একটা চিঠি পোস্ট করতে এতক্ষণ লাগে ?
বসে আছিস কার জন্যে ?
পিওনের জন্যে! চিঠির সঙ্গে আমার দস্তানাটাও বাক্সের মধ্যে পড়ে গেল যে!

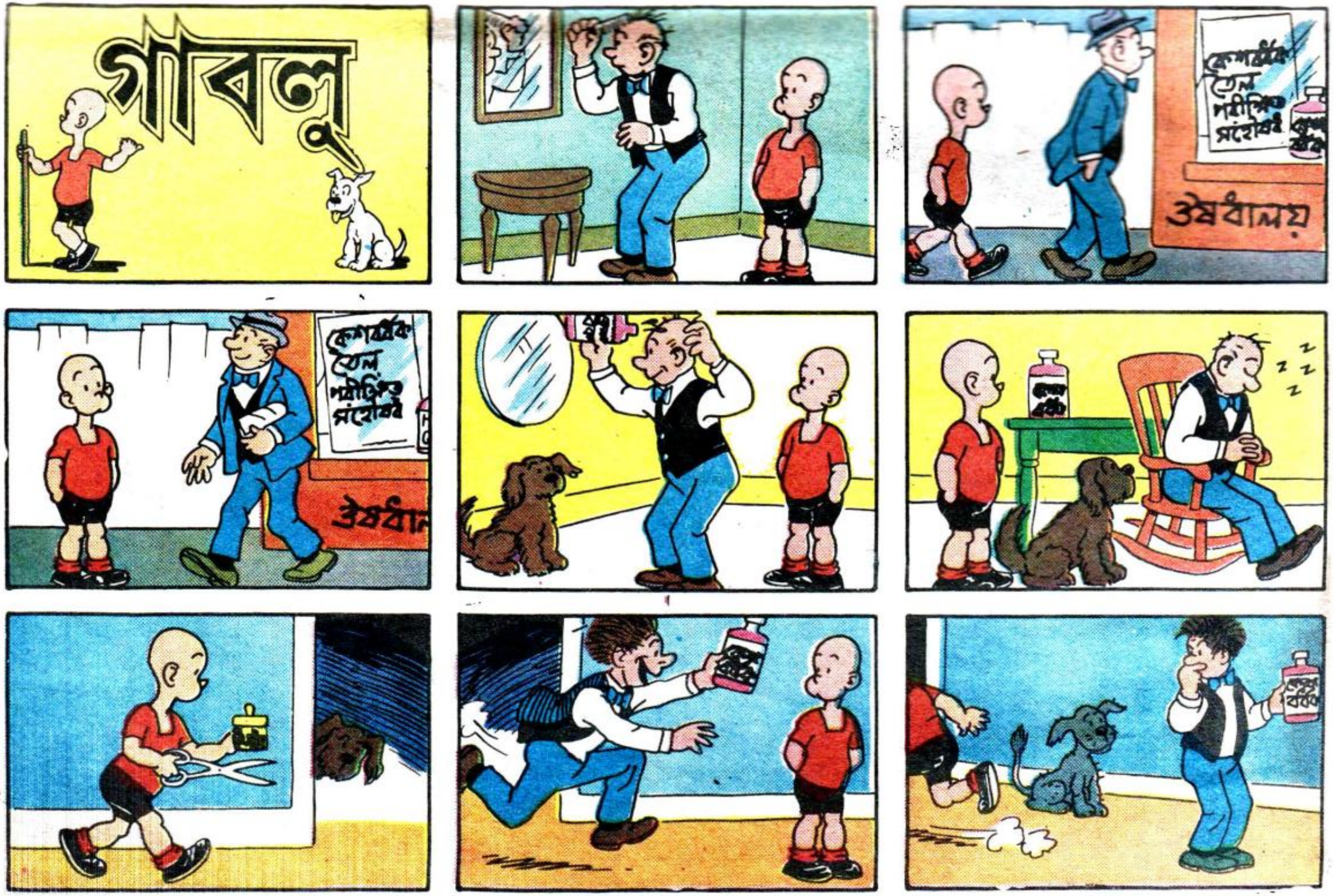
গাবলু
কেশবর্ধক
তেল
পরীক্ষিত
মহৌষধ
ঔষধালয়
কেশবর্ধক
তেল
পরীক্ষিত
মহৌষধ
ঔষধাল

তিন্ ভঙ্গির তিন গরু—১

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

নানান ভাবে বসে থাকা গরুকে ঐ একই ছকে ধরা কত সহজ। ইচ্ছে করলে গরুর বসে-থাকা আরও নানা ধরনে দেখাতে পারো।

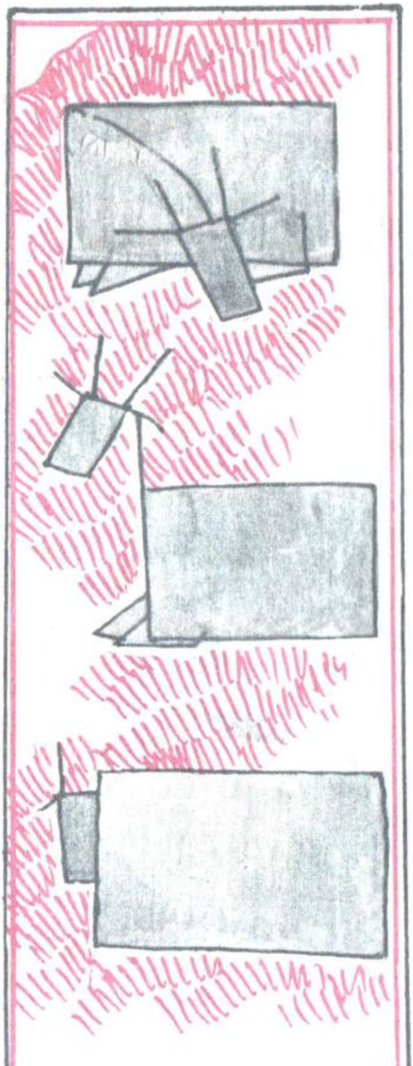

কাগজের খেলনা : হাঁস ১

কারিগর

নমুনা-মাফিক খেলনা তৈরির জন্য তোমায় কাছে রাখা বোর্ডের ওপর ১নং নকশা শরীরের অংশ আর ২নং নকশা মুখ আর গলার অংশ ছকে নাও। ছকার কাজ শেষ হলে বোর্ডের ওপর থেকে ছকের নকশা কেটে তুলে নাও। কেবল মনে রেখো ২নং নকশার ছক কাটার সময় বোর্ড ভাঁজ করে একটা অংশ কাটলেই নকশার মতো দুটো অংশই পাবে।

জেনে রাখো: ১। নকশার ছক যেন নিখুঁত ভাবে কাটা হয়। ২। নতুন খেলনা তৈরির সময় তার চরিত্র অনুযায়ী ভাঁজের কথা ভাববে।

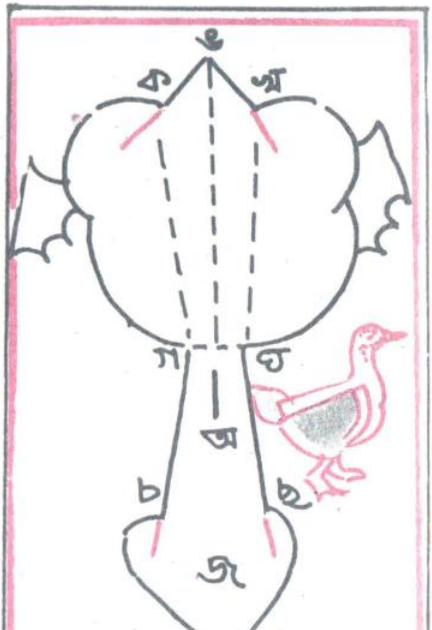

এখন এক নয়, দুরকমের ঃ

ফরহ্যান্স মাড়ির জন্যে

সুপরিচিত কমলা রঙের প্যাকে

আর এখন...উজ্জ্বল নীল রঙের প্যাকে

ফরহ্যান্স

শক্তিপূর্ণ

ফ্লোরাইডযুক্ত, দাঁতের ক্ষয় রোধের জন্যে

এর স্বাদ ভালো !

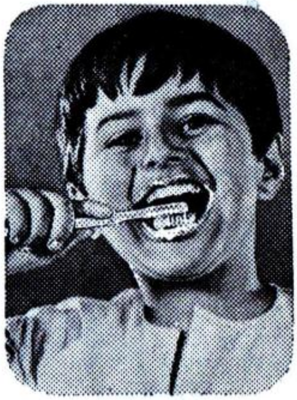

এতে ফেনা হয় !

এতে ফ্লোরাইড আছে !

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

মাড়ি যদি দুর্বল হয় কিংবা ফুলে যায়, আপনার সুস্থ দাঁতও আলগা হয়ে পড়ে যেতে পারে। ফরহ্যান্স দিয়ে দাঁত ব্রাশ ও মাড়ি মালিশ করার অভ্যাস মাড়ি মজবুত আর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

রাইড দাঁত রক্ষা করে

ফ্লোরাইড বাচ্চাদের দাঁতের এনামেল মজবুত করে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ফরহ্যান্সের ফ্লোরাইড বড়দের দাঁতের এনামেলের প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষয়কারী বীজাণুর হাত থেকে রক্ষা করে।

উজ্জ্বল নীল রঙের প্যাকে

ফ্লোরাইডযুক্ত ফরহ্যান্স মাড়ি ও দাঁত দুই-ই রক্ষা করে

Registered TM : Geoffrey Manners & Co. Limited.

197 F 203 BN

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

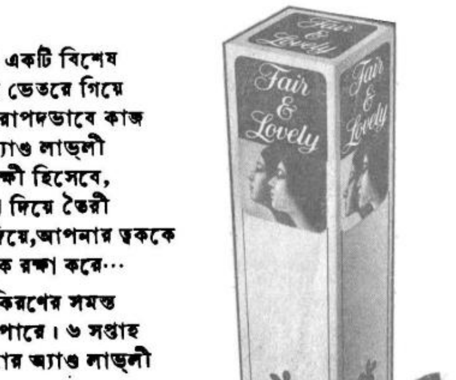

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন লিন্টাস-FALOV.10-172 BG